সমৃদ্ধ আগামী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

৫০ বছরের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৬৬)

(প্রস্তাবিত খসড়া)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়

প্রনয়ণকালঃ- অক্টোবর/২০১৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নথি: ৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯.০০৩.১৬- **২৯**

তারিখঃ ০৫ মাঘ ১৪২৪ / ১৮ জানুয়ারি ২০১৮

বিষয় : " ৫০ বছরের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৬৬) খসড়া এর নীতিগত অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৯/১০/২০১৭ তারিখের ৬০৩ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত সমৃদ্ধ আগামী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে " ৫০ বছরের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা (Master Plan) (২০১৭-২০৬৬) এর নীতিগত অনুমোদন নির্দেশক্রমে প্রদান করা হল।

(দেলোয়ারা বেগম)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৬৬৯৪৭
e-mail:livestock-1@mofl.gov.bd

মহাপরিচালক (অ.দা.),
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি সড়ক,
ফার্মগেইট, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্মসচিব (প্রাস-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৫০ বছরের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৬৬)

১. ভূমিকা

শোষনমুক্ত ও বৈষম্যহীন একটি আধুনিক সমাজ গঠনের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শুভ অভ্যুদয় ঘটে ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধ বিধ্বস্ত এদেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ছিল এক বড় চ্যালে ঞ্জ। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ ছিল ৬ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ডলার। ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২২১ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ ৪৫ বছরে জিডিপির আকার বেড়েছে ৩৫ গুণ। শতকরা হারে তা বে ড়েছে ১৪৪ শতাংশ। আর জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে কৃষি, বনজ ও শিল্প খাত (http://www.dailysangram.com)।

ঘনবসতিপূর্ণ কৃষি নির্ভর উন্নয়নশীল এ দেশের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষির ওপর অনেকাংশে ই নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০% গ্রামীন এলাকায় বসবাস করে এবং তাদের প্রধান জীবিকা কৃষি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, দেশের মোট ২.৮৭ কোটি খানার মধ্যে ১ .৪৭ কোটি অর্থাৎ প্রায় ৫১.৩৩% খানা কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। কৃষি বলতে শুধু ফসল উৎপাদনকে বুঝায় না এর সঙ্গে অন্যান্য বিভাগ যেমন - প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যসম্পদ বিভাগও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। বিশেষ করে বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, পুষ্টি নিরাপত্তা , আত্মকর্মসংস্থান এবং দারিদ্র নিরসনে প্রাণিসম্পদের অবদান অতীব গুরূত্বপূর্ণ। আর তাই গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির সংখ্যা বেড়েই চলেছে, অর্থাৎ দেশে শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি হলেও জনগণ পশুপালন থেকে বিচ্যুত হয়নি (সারণী-১)। সেই সাথে উপযুক্ত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রাণিসম্পদ খাতকে আজ কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনের একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করেছে। দেশের বেকার জনগোষ্ঠী এবং নারীরা প্রাণিসম্পদ পালনে সম্পৃক্ত হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছে। দেশের বহু পরিবার আজ কেবলমাত্র দু'টি উন্নত জাতের গাভী অথবা স্বল্প পরিসরে ব্রয়লার/লেয়ার মুরগি পালন করে স্বাবলম্বীতার মুখ দেখেছে। এক একটি পশু একটি সঞ্চয়ী ব্যাংকের মত। এক একটি আমানত। বাজার মূল্যে দুধ, মাংশ ও ডিম অন্যান্য প্রাণিজ কিংবা উদ্ভিজ প্রোটিন অপেক্ষা মূল্য সাশ্রয়ী। তাই প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ছাড়াও, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রাণিসম্পদ খাত বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। যদিও উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে দুধ, মাংস ও ডিমের অভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি ঘটছে (সারণী-২)। তবে সবচেয়ে লক্ষনীয় হলো চাহিদা ও উৎপাদনের তুলনামূলক বিচারে উৎপাদন ঘাটতি ক্রম হ্রাস্বমান।

সারণী-১: প্রজাতিভেদে বছরওয়ারী পশুপাখির সংখ্যা

অর্থবছর	একক	প্রজাতি					
		গরু	মহিষ	ছাগল	ভেড়া	মুরগি	হাঁস
২০১০-১১	সংখ্যা লক্ষ	২৩১.২১	১৩.৯৪	২৪১.৪৯	৩০.০২	২৩৪৬.৮৬	৪৪১.০২
২০১১-১২	সংখ্যা লক্ষ	২৩১.৯৫	১৪.৪৩	২৫১.১	৩০.৮	২৪২৮.৬০	৪৫৭.০০
২০১২-১৩	সংখ্যা লক্ষ	২৩৩.৪১	১৪.৫	২৫২.৭৭	৩১.৪৩	২৪৯০.১১	৪৭২.৫৪
২০১৩-১৪	সংখ্যা লক্ষ	২৩৪.৮৮	১৪.৫৭	২৫৪.৩৯	৩২.০৬	২৫৫৩.১১	৪৮৮.৬১
২০১৪-১৫	সংখ্যা লক্ষ	২৩৬.৩৬	১৪.৬৪	২৫৬.০২	৩২.৭০	২৬১৭.৭০	৫০৫.২২
২০১৫-১৬	সংখ্যা লক্ষ	২৩৭.৮৫	১৪.৭১	২৫৭.৬৬	৩৩.৩৫	২৬৮৩.৯৩	৫২২.৪০

সারণী-২: দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতির তুলনামূলক চিত্র

উপাদান	চাহিদা		উৎপাদন		জনপ্রতি প্রাপ্যতা		ঘাটতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	২০০১	২০১৬	২০০১	২০১৬	২০০১	২০১৬	২০০১	২০১৬
দুধ (মি.টন)	১১.৮৬	১৪.৬৯	১.৭৮	৭.২৭	৩৭.৫১ (মিলি)	১২৫.৫৯ (মিলি)	১০.০৮	৭.৪১
	(দৈনিক জনপ্রতি ২৫০ মিলি ভিত্তিতে)							
মাংশ (মি.টন)	৫.৬৯	৭.০৫	০.৭৮	৬.১৫	১৬.৪৪ গ্রাম	১০৬.২১ গ্রাম	৪.৯১	০.৯০
	(দৈনিক জনপ্রতি ১২০ গ্রাম ভিত্তিতে)							
ডিম (মি. সংখ্যা)	১৩৫২০	১৬৭৪৪	৪৪২৪	১১৯১২.৪	৩৪.০৩ টি	৭৫.০৬ টি	৯০৯৬	৪৮৩১.৬
	বাৎসরিক জনপ্রতি ১০৪টি ভিত্তিতে							

সূত্র: Livestock Economy at a Glance, 2015-2016

১.১ প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের ইতিকথা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয় হতে গত ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-এ মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়ণ সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ৫০ বছরে প্রাণিসম্পদ এর অবস্থা যথা গরু , ছাগল, ভেড়া, মহিষ, শুকুর, হাঁস-মুরগী, গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, ডিম, দুধ ও মাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করত : অনুমোদনের নিমিত্তে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে ১৪/০৫/২০১৬ ইং তারিখে তৎকালীন মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জনাব অজয় কুমার রায়ের সভাপতিত্বে ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ডা : মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খান এবং ডা: মোছাদ্দেক হোসেন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর -এ মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়ণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক ২৫ (পঁচিশ) সদস্য বিশিষ্ট কোর কমিটি গঠন করা হয়।

গত ২৪/০৫/২০১৬ ইং তারিখে কোর কমিটির ১ম সভা মহাপরিচালক , প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কোর কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল সংশ্লিষ্ট পরিচালক মহোদয়কে নিজস্ব দপ্তরের জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একইসাথে সংশ্লিষ্ট পরিচালক মহোদয়কে নিজস্ব দপ্তরের মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়ণের লক্ষ্যে চাহিদানুযায়ী খসড়া মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুতির নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রতিটি উপ-কমিটি সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের নিয়ে

দফায় দফায় সভা করেন এবং নিজস্ব দপ্তরের জন্য পৃথক পৃথক খসড়া মাষ্টার প্ল্যান এবং আনুষাঙ্গিক তথ্যাদি কোর কমিটির নিকট প্রেরণ করেন। কোর কমিটির ২য় সভা গত ০৫/০৯/২০১৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপ-কমিটি হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাচাই বাছাইকরত: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের খসড়া মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। গত ১৮/০৭/২০১৭ ইং তারিখে প্রাণিসম্পদ অর্থনীতি শাখা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া মাষ্টার প্ল্যানের উপর আভ্যন্তরীন যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত যাচাই সভায় উপস্থিত প্রাণিসম্পদ অর্থনীতি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং মহাপরিচালক প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের সহিত মত বিনিময়ের আলোকে প্রস্তাবিত খসড়া মাষ্টার প্ল্যানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরিমার্জন করা হয়। গত ১৩/১১/২০১৭ ইং তারিখে পরিমার্জিত খসড়া মাষ্টার প্ল্যানটি র উপর কনসালল্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয় , যেখানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্ত রের সাবেক ৫ (পাঁচ) জন মহা-পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত। তদপ্রেক্ষিতে উক্ত সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা য় প্রয়োজনীয় পরিমাজর্ন করে এ খসড়া মহাপরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.২ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার পটভূমি

বাংলাদেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠি গ্রামে বাস করে। গ্রামে বসবাসকারী বেশীরভাগই ভুমিহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও দরিদ্র খামারী। আর একথা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে দারিদ্র্য সবসময় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সাক্ষরতা ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে এদেশে প্রকৃত দরিদ্র সংখ্যা বা দরিদ্র কারা, সে বিষয়ে রয়েছে বিস্তর দ্বিমত। ২০১১ সালের ক্রয় ক্ষমতা সমতার (পিপিপি) ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংক ১.২৫ ডলারকে দারিদ্র রেখা নির্ধারণ করেছে। অর্থাৎ দৈনিক সোয়া ডলার বা ১০০ টাকার কম আয় করে এমন মানুষকে মোটা দাগে গরিব বলা হয়। ২০১৫ সনের জুন মাসে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত তথ্যমতে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২৫.৬%। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর ফলাফলে এই হার ছিল ৩১ শতাংশ। বর্তমানে অতি দারিদ্রের হার ১২.৪ শতাংশ। অর্থাৎ দারিদ্র ক্রমান্বয়ে কমছে। দেশে একজন মানুষ না খেয়ে মারা গেছেন এমন রেকর্ড নেই। উত্তর বঙ্গে রংপুর, কুড়িগ্রাম অঞ্চলের মঙ্গা এখন অপরিচিত শব্দ। সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের কলেবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রসারণ করেছেন। জাতীয় বাজেটের প্রায় ২.২ ভাগ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। টেস্ট রিলিফ, ভিজিএফ, ভিজিডি, কাবিখা, কাবিটা, ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচী, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ ভাতা, বিভিন্ন জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস ইত্যাদি বহুবিধ কর্মকান্ডের মাধ্যমে বর্তমান সরকার সীমিত ক্রয় ক্ষমতার পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের খাদ্য-পুষ্টির ব্যবস্থা করে যাচ্ছে।

দেশের এ সকল দরিদ্র মানুষের আয়ের উৎস, পুষ্টি সরবরাহ এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচনে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের গুরত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে এর গতিকে ক্রমান্বয়ে বেগবান করছে প্রাণিসম্পদের বাণিজ্যিক বিস্তরণ। কারণ প্রাণিসম্পদ আজ নানা ভূমিকায় অধিষ্ঠিত একটি সমৃদ্ধ খাত। কেননা , এ খাতটি জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ , দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন বা জিডিপি 'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৪.২১ ভাগ। এছাড়া ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৩২,৯১০ কোটি টাকা, যা বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের তুলনায় ৩০২৩ কোটি টাকা বেশী (সূত্র: বিবিএস ২০১৫-২০১৬)। অধিকন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Survey on Private Sector Gross Fixed Capital

Formation in Cultivated Biological Resource শীর্ষক প্রতিবেদনে জানা যায় জিডিপি ক্যালকুলেশনের ভিত্তি বছর পরিবর্তিত হলে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপিতে আরও বাড়তি প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা যুক্ত হবে। তাই যদি হয় সেক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের জিডিপির আকার দাঁড়াবে প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকার উপরে (সূত্র: উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৫-২০১৬, পৃষ্ঠা: ১০)।

প্রাণিসম্পদের উত্তোরউত্তর সমৃদ্ধি এবং খাদ্যশষ্য উৎপাদনে বাংলাদে শ অনেকদূর এগিয়ে গেলেও , এখনও আমাদের আপা মর জনগনের পুষ্টি চাহিদা পুরণ হয়নি । বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এ সমস্যা শিশু ও নারীদের মধ্যে আরো প্রকট। এখনো প্রতি তিন জন শিশুর একজন শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয় অপুষ্ঠিজনিত কারনে। এদেশের ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই কোনো না কোনো মাত্রার অপুষ্টিতে ভুগছে। আর অপুষ্টির জন্য শিশুদের ওজন হয় কম, সংক্রামক রোগের শিকার হয় এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ হয় বাধাগ্রস্ত। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করতে হলে সবার আগে পুষ্টি হীনতা দূর করতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের প্রতিটি সরকারের চ্যালেঞ্জ ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। বর্তমানে বাংলাদেশ সেই সক্ষমতা অর্জন করেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার মাধ্যমে বর্তমানে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের National Strategy of Accelerated Poverty Reduction (NSAPR-2005) এ বলা ছিল যে ২০১৫ সালের মধ্যেই সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্তত দুটি লক্ষ্য অর্থাৎ দারিদ্র ও অপুষ্টিকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এসব লক্ষ্য অর্জনের মূল মন্ত্র হলো সঠিক পুষ্টিমানের নিশ্চয়তা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের ২০১৫-২০১৬ খ্রি: এর তথ্য মতে নীট প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন প্রাণিসম্পদ খাত হতে ৪৬.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন (১ এমএল দুধ হতে ০.০৩৩ গ্রাম আমিষ, ১ গ্রাম মাংস হতে ০.২১১৬ গ্রাম আমিষ এবং ১ গ্রাম ডিম হতে ০.১২৫ গ্রাম আমিষ বা ১টি ডিম ৬০ গ্রাম হিসেবে ৭.৫ গ্রাম আমিষ হিসাব করে) এবং মৎস্যসম্পদ খাত হতে ৬.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন (১০০ গ্রাম মাছ হতে ১৭ গ্রাম বা ১ গ্রাম মাছ হতে ০.১৭ গ্রাম আমিষ হিসাবে করে)। সুতরাং ২০১৫-২০১৬ খ্রি: প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্যসম্পদ খাত হতে নীট প্রানিজ আমিষের সরবরাহের পরিমান ৫২.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন। তাই বর্তমান সরকার ‘সবার জন্য পুষ্টি নিশ্চিত করা’-র লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদ খাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করে যাচ্ছে। কারন এ বিষয়টি সহজেই অনুমেয় যে কেবলমাত্র প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা (মাংশ, দুধ ও ডিম) বৃদ্ধির মাধ্যমে অনে কাংশে এ পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। আর তাই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে দেশে নিরাপদ দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণপূর্বক মেধাবী, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠন করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আধুনিক-লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সম্প্রসারণ সম্পর্কিত কাজ করে যাচ্ছে।

অতি সাম্প্রতিককালে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরি কল্পনার (২০১৫-২০২০) অনুমোদন করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শুধু শস্যই নয় এর বাইরে নন ক্রপস সে ক্টর, লাইভস্টক উপখাত, ফিসারিজ উপখাত, ফরেস্ট্রি উপখাত, পানি সম্পদ, খাদ্য নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।। এ লক্ষ্যে সরকার ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরকে ভিত্তি ধরে প্রণীত এই পরিকল্পনার মো ট ৩১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার

বিনিয়োগের মধ্যে ৭৭.৩ ভাগ বেসরকারি খাত এবং অবশিষ্ট ২২.৭ ভাগ আসবে সরকারি খাত থেকে। পরিকল্পনায় ৫ বছরব্যাপী বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭.৪ ভাগ।

এই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কৃষি উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় দুধ, মাংস এবং ডিমের ক্ষেত্রে চাহি দা ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (সূত্র:http://www.dailyjanakantha.us)।

দুধ উৎপাদন

২০১৩-১৪ অর্থবছরে দুধের চাহিদা ছিল ১৪ দশমিক শূন্য ২ মিলিয়ন টন, উৎপাদিত হয়েছে ৬ দশমিক শূন্য ৯ মিলিয়ন টন, পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দুধের চাহিদা ছিল ১৪ দশমিক ৬৯ মিলিয়ন টন আর উৎপাদন হয়েছে ৭ দশমিক ২৭ মিলিয়ন টন। ২০২০-২১ অর্থবছরে চাহিদা হবে ১৫ দশমিক ২২ মিলিয়ন টন আর উৎপাদন হবে ১০ দশমিক ৩৫ মিলিয়ন টন।

মাংশ উৎপাদন

মাংসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৭৩ মিলিয়ন টন আর উৎপাদন ৪ দশমিক ৫২ মিলিয়ন টন। পরি কল্পনা অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চাহিদা ছিল ৭ দশমিক শূন্য ৫ মিলিয়ন টন আর উৎপাদন হয়েছে ৬ দশমিক ১৫ মিলিয়ন টন। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাংসের চাহিদা হবে ৭ দশমিক ৭০ মিলিয়ন টন আর উৎপাদন হবে ৬ দশমিক ৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

ডিম উৎপাদন

ডিমের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে চাহিদা ছিল এক হাজার ৫৯৭ কোটি ৪৪ লাখ টি ডিমের আর উৎপাদন এক হাজার ১৬ কোটি ৮০ লাখ টি। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডিমের চাহিদা ছিল এক হাজার ৬৭৪ কোটি ৪০ লক্ষ টি আর উৎপাদন হয়েছে এক হাজার ১৯১ কোটি ২৪ টি। ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিমের চাহিদা দাঁড়াবে এক হাজার ৮০৫ কোটি ৪৪ লাখ টি আর উৎপাদন হবে এক হাজার ৭৮১ কোটি ৫০ লাখ টি।

বিগত কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়াও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতাধীন সাম্প্রতিক সময়ে প্রণীত প্রজেক্ট 'ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১' ঘোষণায় অন্যান্য খাতের ন্যায় প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি র তাগিদ দেয়া হয়েছে। কারণ প্রণীত প্রজেক্ট ২টি'র (দুই) মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা। আর বাংলাদেশ এ প্রত্যাশা পূরণের পথে হাঁটছেও উপযোগী ছন্দে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে।

'ভিশন ২০২১ বা ভিশন ২০৪১' লক্ষ্য অনুযায়ী চাহিদার তুলনায় প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ঘাটতিও হ্রাস্ব করতে হবে। প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যনুযায়ী বর্তমানে চাহিদার তুলনায় দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন যথাক্রমে ৫০%, ৮৮% এবং ৭২% ভাগ। ভিশন ২০২১ অনুযায়ী দেশের ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার চাহিদার আলোকে প্রানিজ আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সুতরাং পরিকল্পনা অনুযায়ী দুধ, ডিম এবং মাংসের উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে , একইসাথে মনে রাখতে হবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের চাহিদাও বাড়বে তার অনেক বেশি।

প্রস্তাবিত “৫০ বছরের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায়” প্রেক্ষিত জনসংখ্যার আলোকে প্রতি ৫ বছর পর পর প্রাণিসম্পদের দুধ, মাংস ও ডিমের পুষ্টিগত চাহিদা ও প্রাণিজাত পণ্যের রপ্তানী বিবেচনায় পর্যায়ভিত্তিক প্রেক্ষিত চাহিদা ও উৎপাদনের আলোকে প্রনণয় করা হয়েছে। প্রণীত এই পরিকল্পনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্ত রের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তথ্য -উপাত্তকে ভিত্তি ধরে সকল হিসাব নির্ধারন করা হয়েছে।

১.৩ প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনার সম্ভাব্য আউটপুট (Output)

- কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা ২০৩১ সাল নাগাদ ৭৫ ভাগ এবং ২০৪৬ সাল নাগাদ ১০০ ভাগ গবাদিপশুর দেশী জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি।
- দুধ,মাংশ ও ডিম উৎপাদনে অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণে স্বাবলম্বীতা অর্জন, শতভাগ প্রক্রিয়াজতকরণ ও কর্মসংস্থন সৃষ্টি।
- জুনোটিক রোগসহ প্রানিরোগের শক্তিশালী ইপিডেমিওলোজি এবং সার্ভিলেন্স ব্যবস্থার জোরদারকরনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেবা সম্প্রসারন ও মানোন্নয়ন।
- ভেটেরিনারি সার্ভিস, ওয়ান হেলথ সার্ভিস উন্নতিকরন, কার্যকর সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থা চালু ও জনসচেতনা সৃষ্টি র মাধ্যমে প্রাণি উৎস হতে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগসমূহের প্রকোপ হ্রাস।
- নিরাপদ মাংশ উৎপাদন নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার, লাইভ বার্ড মার্কেট এবং আধুনিক কসাইখানা স্থাপন।
- প্রক্রিয়াজাত প্রাণিজ এবং চামড়াজাত পন্য উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈদিশিক মূদ্রা অর্জন।
- প্রাণিসম্পদ ডাটাবেজ ও ডিজিটালাইজেশ ন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সকল অনলাইনভিত্তিক সেবা প্রদান ব্যবস্থা চালু।
- স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের আইন প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ এবং প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইনী কাঠামোর সংস্কার ও উন্নয়ন।
- নিবিড় ও দ্রুত প্রাণিসেবা ব্যবস্থা নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী জে লা, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন থানা সমূহে Mobile Veterinary Clinic (MVC) চালুকরন।
- জাতীয় ভেটেরিনারি ইপিডেমিওলোজি ইনস্টিটিউট, হ্যাচারী ও এ্যানিমেল ফিড রেগুলেটরি কাউন্সিল, জাতীয় ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, National Veterinary Drugs Regulatory Authority, ভেটেরিনারি ভ্যাক্সিন সিড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, জাতীয় ডেইরি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জাতীয় পোল্ট্রি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জাতীয় ছাগল-ভেড়া রির্সাচ ইনস্টিটিউট, জাতীয় পেট এ্যানিমেলস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও জাতীয় ল্যাবরেটরি এ্যানিমেলস রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন।
- জনস্বাস্থ্যে ও জনস্বার্থে দেশব্যাপী পোল্ট্রি বিপণনকে ওয়েট মার্কেট থেকে ড্রেস্ড মার্কেটে রূপান্তর।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রন, গবেষনা কার্যক্রম জোরদারকরনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা লাভ।
- অন্ত: ও বহি: পরজীবী, প্রোটোজোয়া, ফাংগাই, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের ডিএনএ/আরএনএ এর নিওক্লিওটাইড সিকোয়েন্সিং এবং নিওক্লিওটাইড (টেমপ্লেট),মহিষ ও গরুর ভ্রূণ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সিমেন ব্যাংক ও জীন ব্যাংক স্থাপন।
- প্রাণি রোগ নির্ণয় কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে গবেষণাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন ও এক্রেডিটেশন।

২. প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ

২.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যপরিধি

২.১.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

২.১.২ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপুরণ।

২.১.৩ প্রাণিসম্পদ দপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা।
- গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দশ্যেসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

২.১.৪ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি

- ❖ প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রাণিপালন সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের কল্যাণ সাধন।
- ❖ প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।
- ❖ প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- ❖ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ❖ উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ।
- ❖ জনসাধারণের স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজাত খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান।
- ❖ প্রাণি উৎস্যজাত সংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি থেকে জনসাধরণকে মুক্ত রাখা।
- ❖ প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ও বিপণনের বাধাসমূহ দূরীকরণে সহায়তা প্রদান।
- ❖ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য প্রাণিজাত পণ্য ও উপজাতের গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধান।
- ❖ প্রাণিসম্পদের জীব নিরাপত্তা বিধান ও পরিবেশ সংরক্ষণ।
- ❖ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বেকারত্ব হ্রাসকরণ।
- ❖ প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন ও বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ❖ দূর্যোগকালিন সময়ে জরুরী প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদান।

২.২ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা/নীতিমালা

বিগত সময়ে বা বর্তমানে চলমান সকল পরিকল্পনা বা নীতিমালার মূল্য লক্ষ্য হলো প্রা নিজ আমিষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরত : অপুষ্টির সমস্যা সমাধান, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র জনগনের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্ন য়ন । এ যাবত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত যে সকল নীতিমালা বা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে বা চলমান রয়েছে, তা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল:

২.২.১ জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা – ২০০৭

প্রাণিসম্পদ উপ সেক্টরের সর্বাঙ্গিন টেকসই উন্নয়নের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৭ একটি নীতি কাঠামো প্রনয়নের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্নিত বিষয়াদি গুরুত্ব বহন করে।

- বেসরকারি খাতের অংশগ্রহনের মাধ্যমে ছোট আকারের দুগ্ধ এবং পোল্ট্রি খামারীদের প্রণোদনা প্রদান।
- উচ্চ সম্ভাবনাময় এলাকাগুলিতে বিশেষ প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, মুরগী এবং হাঁস পালনে উদ্ভুদ্ধ করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে ডিএলএস এর কার্যপরি ধি গতিশীল করা। আইন প্রনয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থাকে জোরদার করা যাতে ঔষধ, খাদ্যে এবং জাত উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর অপব্যবহার রোধ হয়।
- পোল্ট্রি এবং গবাদি প্রাণির টিকা উৎপাদনসহ ভেটেরিনারি সেবায় বেসরকারি উদ্যোক্তদের উদ্ধুধকরন।

জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবলী

- ডিম, দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরন এবং মুল্য সংযোজনে টেকসই উন্নয়ন লাভের জন্য উৎসাহ প্রদান করা।
- ভূমিহীন, ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক খামারীদের আয়ের উৎস, পুষ্টি সরবরাহ এবং আত্মকর্মসংস্থান তৈরীতে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
- বেসরকারি খাতের অংশগ্রহন এবং বিনিয়োগ সহজতর করা এবং উৎপাদিত প্রানিজাত প ণ্যের জন্য দেশ-বিদেশে বাজার তৈরী করা।

জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা ১০টি সংকটপুর্ন কর্মএলাকা সনাক্ত করেছে যা নিম্নরুপ:

- দুগ্ধ খামার স্থাপন এবং মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি
- হাঁস-মুরগীর ক্রমবিকাশ
- প্রাণি স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সেবা
- প্রাণি খাদ্য এবং ঘাস উৎপাদন
- জাত উন্নয়ন
- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উন্নয়ন
- প্রাণিজাত পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা.

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা
- ঋন সুবিধা এবং বীমা প্রক্রিয়া
- গবেষণা এবং সম্প্রসারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

২.২.২ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG):

২০০০ সালে জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) বা সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে, যা শেষ হলো ২০১৫ সালে৷ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য নিদিষ্ট ৮ টি লক্ষ্যের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, জেন্ডার সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন উল্লেখযোগ্য। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার প্রাণিসম্পদ উপখাতকে বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মকৌশলের প্রধান ৬টি খাতের মধ্যে অন্যতম উপখাত হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এমডিজি অনুযায়ী সরকার আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য চারটি কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল:

দারিদ্র বিমোচনে কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১. পশুসম্পদ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. পোল্ট্রি খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ
৩. দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ
৪. পশুসম্পদ গবেষণা ও সম্প্রসারণ জোরদারকরণ

২.২.৩ ভিশন ২০২১

বাংলাদেশের ভিশন ২০২১ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সংকট মোকাবেলা এবং একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য প্রাণিসম্পদ উপ সেক্টরে নিম্নরূপ বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষবস্তু নির্ধারন করা হয়

- দেশের ৮৫% জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় প্রাণিজাত খাদ্যের চাহিদা পূরন করতে বছরভিত্তিক মাথাপিছু ১০৪ টি ডিম, ১৫০ মিলি দুধ ও ১১০ গ্রাম মাংসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।
- বেকারত্বের সংখ্যা ২.৮ কোটি (২০১৩ সাল অনুযায়ী) থেকে ২০২১ সাল নাগাদ ১.৫ কোটিতে নামিয়ে আনা এবং ১.১২ কোটি মানুষের প্রত্যক্ষভাবে চাকুরীর সুযোগ তৈরি করা।
- প্রাণিসম্পদ উপ সেক্টর ২৫% দারিদ্র বিমোচনে এবং ১৫% অতি দারিদ্র দূরীকরনে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।
- প্রাণি চিকিৎসা সেবা প্রদানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়াতে হবে যাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়।
- দরিদ্র জনগনের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরি করা।

২.২.৪ সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG):

এমডিজির ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল পর্যন্ত সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) ঘোষনা করেন। এই এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের উদ্দেশ্য হলো : দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিমান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যমান অর্জন, মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, নারীর সর্বজনীন ক্ষমতায়ন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটে শন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলাসহ সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস্ -এ প্রাণিসম্পদ সেক্টর সংশ্লিষ্ট মোট ৯ (নয়) টি অভীষ্ঠ (Goals) এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রা (Targets) নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়ন করছে। নিম্নে তা বর্ণিত হলো:

অভীষ্ঠ-১: দরিদ্রতার অবসান (No poverty)

অভীষ্ঠ-২: ক্ষুধামুক্তি ও পুষ্টি (Zero hunger & nutrition)

অভীষ্ঠ-৩: সুস্বাস্থ্য (Good health & well being)

অভীষ্ঠ-৮: টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান (Sustainable economic growth & employment)

অভীষ্ঠ-৯: অবকাঠামো, শিল্পায়ন ও উদ্ভাবন (Industry, innovation & infrastructure)

অভীষ্ঠ-১০: বৈষম্য দূরীকরণ (Reduced inequalities)

অভীষ্ঠ-১২: টেকসই উৎপাদন ও কনজাম্পসন (Sustainable production & consumption)

অভীষ্ঠ-১৫: বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য (Ecosystem & biodiversity)

অভীষ্ঠ-১৭: বৈশ্বিক অংশীদারীত্ব (Global partnership)

২.৩ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনা

দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও রয়েছে অপার সম্ভাবনা। প্রস্তাবিত মহা পরিকল্পনায় **মেয়াদভিত্তিক (স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী) কৌশলগত পরিকল্পনা** বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৬৬ সালের মধ্যে প্রাণিসম্পদ খাতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে অপার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে:

- বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ঘনত্ববিশিষ্ট বৃহৎ এবং বৈচিত্র্যময় গবাদিপশু ও পাখির স্টক, যা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম;
- দেশের খাদ্যশষ্যের উৎপাদনশীলতা সম্পৃক্ততার (Saturated) প্রায় কাছাকাছি হলেও প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা এখনও সম্পৃক্ততার লেভেলের অনেক নীচে, যা উন্নীত করার মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা রয়েছে;
- দেশের বৃহৎ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর (প্রায় ৫.৯৩ কোটি, সূত্র: বিবিএস, ২০১৫) অধিকাংশের বয়স ১৫-২৯ বছরের (প্রায় ৩২%) মধ্যে। তবে, দেশের মোট কর্মক্ষম লোকের ৪.২% অর্থাৎ প্রায় ২৫ লক্ষ কর্মক্ষম লোক বেকার অবস্থায় রয়েছে। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে প্রাণিসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে এ খাতের উন্নয়ন আশাব্যঞ্জক হবে;
- দেশের কর্মক্ষম নারীর সংখ্যা প্রায় ১.৭৮ কোটি। সুযোগ রয়েছে অন্যান্য নারীদেরকে প্রাণিসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত করার, কেননা গ্রাম্য এলাকায় হাঁস-মুরগি এবং ক্ষুদ্রাকৃতির গবাদি খামার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা করে থাকেন;

- দেশের দুগ্ধ উৎপাদনের প্রধান ও অন্যতম অনুষঙ্গ গাভী । যেখানে মোট দুধ উৎপাদনের মাত্র ২% দুধ মহিষের থেকে উৎপাদিত হয়। অথচ, দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চলীয় এবং হাওড় এলাকায় মহিষ উৎপাদনের উজ্জল সম্ভাবনা আছে;
- কোয়েল, তিতির, টার্কি ইত্যাদি অপ্রচলিত পাখিসমূহের উৎপাদন এখনও তেমন সম্প্রসারিত হয়নি। যদিও দেশে - বিদেশে এসকল পাখির ব্যপক চাহিদা রয়েছে। Untouched এসব ক্ষেত্রসমূহের যথাযথ পরিকল্পনা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব;
- মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের মাংস ও চামড়ার ব্যাপক চাহিদা আছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রক্রি য়াজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানীমুখী শিল্পের সম্প্রসারণের অবারিত সুযোগ রয়েছে;
- সীমিত পর্যায়ে দেশে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত বীফ , দুগ্ধজাত পন্য, বিভিন্ন প্রাণিজ উপজাত বিশ্বের অনেক দেশে রপ্তানী হচ্ছে, যা আরও সম্প্রসারণের অপার সম্ভাবনা রয়েছে;
- দেশের প্রাণি জ আমিষের ডমেস্টিক কনজাম্পসন মূলত অনানুষ্ঠানিক (Unorganized)। চাহিদার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে উৎপাদিত পণ্যসমূহ শতভাগ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বেসরকারি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ আছে।
- বাংলাদেশের অনুকূল জলবায়ু এবং কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চল প্রাণি উৎপাদনের জন্য একটি উত্তম স্থান বলে বিবেচিত;
- কম খরচে শ্রমের প্রাপ্যতা প্রাণিসম্পদ খাতের একটি অন্যতম অনুঘটক।

৩। প্রস্তাবিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রনণয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দরিদ্রতা ও অপুষ্টি দূর করা।
- কর্মসংস্থান এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতি তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা।

উদ্দেশ্য

- কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় অধিক সংখ্যক দেশী জাতের গাভী আনয়নের দ্বারা জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তাই প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনায় ২০৩১ সাল নাগাদ ৭৫ ভাগ এবং ২০৪৬ সাল নাগাদ ১০০ ভাগ গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন।
- দুধ উৎপাদনে ২০৪৬ সালে অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণে স্বাবলম্বীতা অর্জন এবং ২০৬৬ সালের মধ্যে উৎপাদিত দুধের শতভাগ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াজাতকরণ।
- মাংশ উৎপাদনে ২০৩১ সালে অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণে স্বাবলম্বীতা অর্জন এবং এবং ২০৬৬ সালের মধ্যে উৎপাদিত মাংশের শতভাগ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াজাতকরণ।
- ডিম উৎপাদনে ২০৩১ সালে অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণে স্বাবলম্বীতা অর্জন এবং ২০৬৬ সালে এ শিল্পে প্রায় ৯০ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

- ভেটেরিনারি সার্ভিস, ওয়ান হেলথ সার্ভিস, জুনোটিক রোগ সহ প্রানিরোগ সার্ভিলেন্স ব্যবস্থার জোরদারকরণ, শক্তিশালী ইপিডেমিওলোজি সেল গঠন, স্বাস্থ্যসম্মত মাংশ উৎপাদন নিশ্চিতকরন, পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন, কার্যকর সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থা ও জনসচেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণি উৎস হতে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগসমূহ পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণ।
- প্রক্রিয়াজাত প্রাণিজ পন্য যথা: তরল দুধ, মিষ্টি, দই, ঘোল, ঘি, মাখন, ছানা, পনির, প্যাকেটজাত মাংস, ওমেজাম, হাড়ের গুঁড়া, বোন চিপস, জিলাটিন, বুলস্টিক, গরুর লেজের লোম, কেসিং, মেয়োনিজ, চামড়াজাত পণ্য ইত্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈদিশিক মূদ্রা অর্জন।
- চামড়া শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈদিশিক মূদ্রা অর্জন।
- প্রাণিসম্পদ ডাটাবেজের উন্নয়ন ও ডিজিটালাইজেশন , প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইনী কাঠামোর সংস্কার ও উন্নয়ন , প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক এবং পরিবর্তিত জলবায়ূ মোকাবেলায় সক্ষম তা বৃদ্ধি।

৪. প্রাণিজ আমিষ দুধ, ডিম ও মাংশের পুষ্টিমান এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

প্রাণিজ আমিষের দুটি প্রধান উৎস প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্যসম্পদ খাত। প্রাণিসম্পদ উৎস হতে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষ দুধ, মাংস, ডিম দ্বারা পুষ্টির চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব।

প্রাণিজ আমিষের পুষ্টিগুন বিশ্লেষণ

Total Intake নয় বরং Low Dietary Diversification এ মূহুর্তে দেশের জন্য সমস্যা। খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় শুধু কার্বোহাইড্রেট নয়, বরং আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান ইত্যাদির গ্রহণ বাড়াতে হবে। আমিষ আমাদের খাদ্যের ছয়টি উপাদনের একটি। এটি হলো সব জীবের মুখ্য উপাদান। ২০টি বিভিন্ন রকম এমাইনো এসিডের নানা রকম সমন্বয়ে গঠিত হয় এক একটি আমিষ। অধিকাংশ আমিষে ১০০ থেকে ১০০০টি এমাইনো এসিড থাকে। এর অর্থ হলো ২০টি এমিনো এসিডের বহু রকম সংযোগ তৈরির সুযোগ আমিষে থাকে। দেহের ওজন ভেদে আমিষের চাহিদা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জন্য দৈনিক আমিষের অনুমোদিত মাত্রা হলো ৪৬ থেকে ৪৭ গ্রাম। শিশুদের দেহের প্রতি কেজির জন্য দরকার ১.৫ থেকে ১.৮ গ্রাম। সহজ হিসেবে প্রতি ১ কেজি ওজনের জন্য প্রতিদিন এ কজন সুস্থ সবল পরিণত মানুষের জন্য ০.৮-১.০ গ্রাম আমিষ গ্রহণ করা উচিত।

আমিষের উৎস হিসেবে উদ্ভিজ আমিষের চেয়ে প্রাণিজ আমিষ (মাংস, মাছ, দুধ, ডিম) অনেক উন্নত মানের। সাধারনত মাংস, ডিম ও দুধে আমিষের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ১৬-২৫, ১০-১৪ এবং ৩-৪ ভাগ (সুত্র:http://www.ais.gov.bd)। কারণ প্রাণিজ উৎসের খাদ্যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বিশেষ করে জিংক, আয়রন ইত্যাদি বেশী থাকে। ভিটামিন বি-১২ একমাত্র প্রাণিজ উৎসের খাদ্যেই পাওয়া যায়। মানব দেহের জন্য অপরিহার্য এমাইনো এসিড যেগুলো মানবদেহে সংশ্লেষ হয় না, এমন সব অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিডে ভরপুর ডিম একটি পরিপূর্ণ খাদ্য। একটি সম্পূর্ণ ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম মানসম্মত প্রোটিন, ৫ গ্রাম উন্নত ফ্যাটি এসিড, ৭০-৭৭ কিলোক্যালরী শক্তি, ১৭৫-২১০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল, ১০০-১৪০ মিলিগ্রাম কোলিন ও অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে। ডিমের অত্যাবশ্যকীয় সকল এমাইনো এসিড যা দেহের ক্ষয়পুরণ ও বৃদ্ধি সাধনে সহায়ক। ডিমের ফ্যাটি এসিডে এলডিএলের চেয়ে

এইচডিএল এর অনুপাত বেশী, ফলে নিয়মিত ডিম খেলে রক্তে এইচডিএলের অনুপাত বাড়ে যা রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইডের উপস্থিতি হ্রাস করতে সহায়ক। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে পালিত মুরগির ডিমে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড বেশী থাকে যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ডিমের কোলিন মস্তিষ্ক কোষ গঠন ও সিগনালিং সিস্টেমে কাজ করে মানুষের স্মরণশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও ডিমে লিউটিন ও জেক্সানথিন রয়েছে যা চোখের দৃষ্টিশক্তিকে উন্নত করে।

সকল বয়সের লোকের জন্য দুধ একটি আদর্শ খাদ্য এবং সব পুষ্টির আধার ও শক্তির উৎস। ১ কাপ দুধ (৮ আউন্স) হতে ৭.৭ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। এছাড়াও দুধে আছে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড, বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, খনিজ পদার্থ যেমন ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, কোবাল্ট, কপার, জিংক, আয়োডিন ও সেলিনিয়াম। দুধের ক্যালশিয়াম দেহের হার গঠন, দুধের ল্যাক্টোজ শিশুকালে মস্তিষ্ক বিকাশের জন্য অনন্য। দুধের কম্পজিশনে পানি ৮৬ দশমিক ৫ শতাংশ, ল্যাকটোজ ৪ দশমিক ৮ শতাংশ, ফ্যাট ৪ দশমিক ৫ শতাংশ, প্রোটিন ৩ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ খুব সামান্য পরিমানে বিদ্যমান মাত্র শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ।

মাংসের আমিষ দেহের ক্ষয়পূরণ, পেশী গঠন ও বৃদ্ধি সাধনে খুবই উপযোগী। গরুর এক টুকরা মাংস থেকে পাওয়া যায় একগুচ্ছ পুষ্টি উপাদান, যার মধ্যে অন্যতম হলো জিংক, ফসফরাস, প্রোটিন, সেলিনিয়াম এবং আয়রন। এ ছাড়া গরুর মাংসে রয়েছে বি১২, বি৬ এবং রিবোফ্লেবিন। গরুর মাংস প্রোটিনের অনেক ভালো উৎস। শারীরিক গঠন ও বৃদ্ধিতে যার ভূমিকা রয়েছে। গরুর মাংস থেকে প্রথম শ্রেণির উন্নতমানের প্রোটিন পাওয়া যায়। তিন আউন্স (৮৫ গ্রাম) গরুর মাংস থেকে প্রায় ২৫ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। সুস্থ মাংসপেশি গঠনে যা বিশেষ ভূমিকা রাখে। গরুর মাংসে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড থাকে, যা ত্বকের জন্য অনেক জরুরি।

প্রাণিজ আমিষের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও গবাদিপশুর বিভিন্ন উৎপাদন (মাংস, দুধ ও ডিম) শক্তির যোগান, উচ্চ মানের খাবার উপযোগী আমিষ এবং গৌণ পুষ্টি উপাদান (মাইক্রোনিট্রিয়ান্ট) প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। খাদ্য নিরাপত্তা ছাড়াও সমাজ ও গ্রামীন অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান ব্যপক ও বহুমূখী। লেখচিত্র-১ হতে দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে জিডিপিতে প্রাণি সম্পদ উপ -খাতের অবদান ছিল ১.৬৬%। একই অর্থ বৎসরে এই উপ -খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৩.২১%। এদেশের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ জমি এখনও গরু-মহিষ দ্বারা চাষ করা হয়। গৃহস্থালী জ্বালানীর শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ আসে প্রাণিসম্পদ খাত থেকে। আর এ কারনেই বর্তমানে এদেশে পরিবারভিত্তিক পশুপালনের বাইরে এখন অনেকগুলো গবাদি পশুখামার গড়ে উঠেছে। শুধুমাত্র গ্রামীন অর্থনীতিতেই নয় বৈদেশিক বানিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতেও রয়েছে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা। এছাড়াও বাংলাদেশের সামনে প্রানিজ খাদ্য ও প্রানিজ অপ্রচলিত উপজাত বিভিন্ন দেশে রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে কুয়েত, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালদ্বীপ, কোরিয়াসহ অন্যান্য দেশে এই জাতীয় পন্য রপ্তানি শুরু হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে শুধুমাত্র উৎপাদিত কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া, চামড়াজাত পন্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্রাদি রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ ৪৩১৭.৮৬ কোটি টাকা আয় করেছে (সূত্র: এক্সপোর্ট

প্রমোশন ব্যুরো)। ফলে এটা সহজেই অনুমেয় যে অদূর ভবিষ্যতে প্রাণিজ প্রক্রিয়াজাত পন্য, খাদ্য এবং অপ্রচলিত উপজাত খাত হতে উৎপাদিত পন্য রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য আরো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

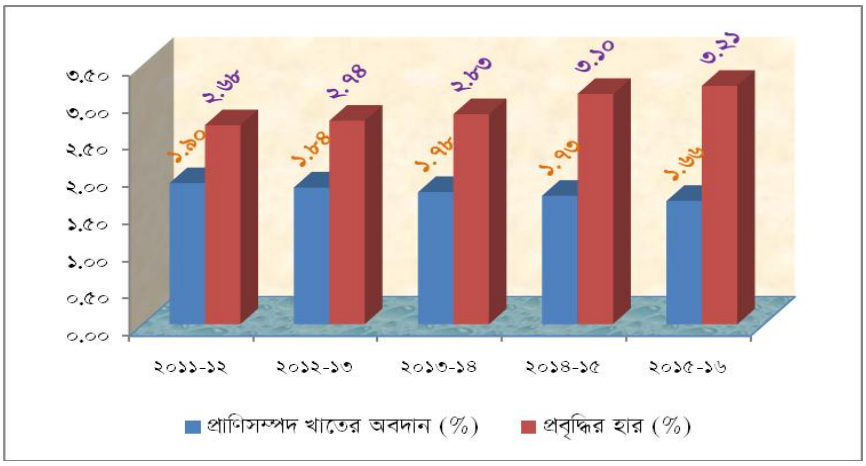

লেখচিত্র-১: প্রাণিসম্পদ খাত থেকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) এর অবদান (%) ও প্রবৃদ্ধির হার (%)।

৫. প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে নিম্নলিখিত Output সমূহের বিশ্লেষণ

৫.১ আমিষ উৎপাদন

মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন এবং জনপ্রতি প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। লেখচিত্র-২ হতে দেখা যায় যে বিগত ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২২.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন, ১১.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন, ৫৪২.২০ কোটি টি। বর্তমান সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং ভিশন ২০২১ এর আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যকরী ও ফলপ্রসু ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিগত ২০১ ৫-১৬ অর্থ বছর শেষে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বেড়ে যথাক্রমে ৭২.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন, ৬১.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন, ১১৯১.২৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ফলে গত ১০ বছরে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৩. ২০ গুণ, ৫.৪৪ গুণ এবং ২.১৯ গুণ এবং জনপ্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২ ৫.৫৯ মিলি/দিন, ১০ ৬.২১ গ্রাম/দিন ও ৭ ৫.০৬ টি/বছর। এসব দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির মূল কারণ হলো কিছু প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, নীতিমালা সংশোধন, এ খাতের সহিত সংশ্লিষ্ট সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরলস পরিশ্রম এবং খামারীদের সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিটি প্রাণির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

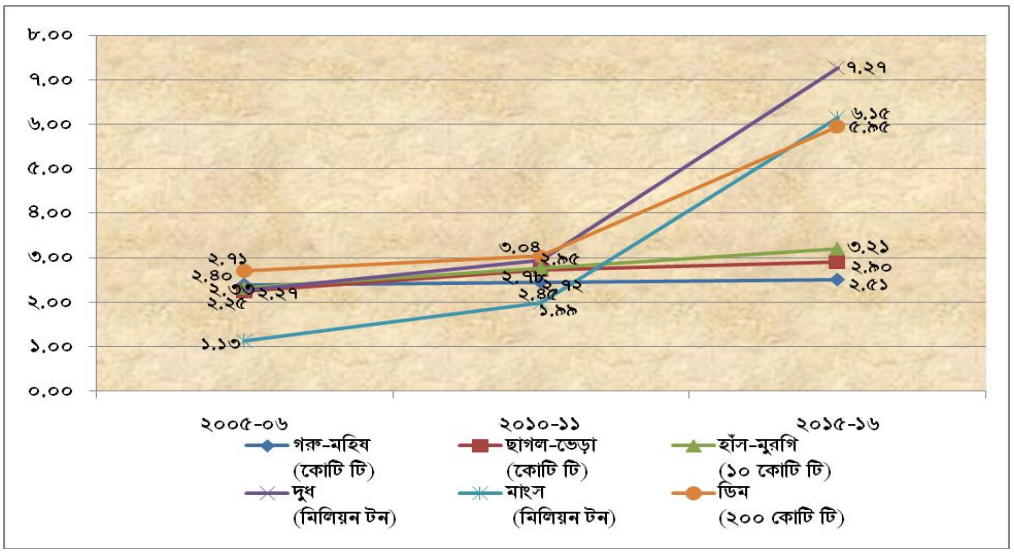

লেখচিত্র-২: সময়ভিত্তিক প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতারবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র।

বাংলাদেশে এখনও প্রধানতম খাদ্যোপাদান হিসেবে ভাতের গুরুত্ব সর্বাধিক। আর ভাত দ্বারা বেশির ভাগ মানুষের প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৭২ থেকে ৭৯ শতাংশ পূরণ হচ্ছে । একজন ব্যক্তির যেখানে ভাত খাওয়ার পরিমাণ ৩৫০ গ্রাম হওয়ার কথা, কিন্তু তারা খাচ্ছে প্রতিদিন ৪৪৮ গ্রাম। দেশে দানাশস্যের উৎপাদন, সব্জির উৎপাদন ইত্যাদি বাড়লেও আনুপাতিক হারে ডাল, তৈলবীজ উৎপাদন বাড়েনি। কিন্তু দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বেড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের উৎপাদনও। কিন্তু তা কাঙ্খিত মাত্রায় বাড়েনি। ফলে দেশের সকল মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারলেও আনুপাতিক পুষ্টির নিরাপত্তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। প্রত্যেকে খাদ্য পাচ্ছেন কিন্তু পুষ্টির নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। সুষম খাদ্যের বিষয়ে রয়েছে অসচেতনতা । প্রোটিন বা আমিষের উৎপাদনে ও কনজাম্পশনে ঘাটতি আছে। অথচ আমিষের চাহিদা পুরণে প্রাণিজ আমিষের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। কারণ প্রাণিজ আমিষে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমান মানব শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড। যা উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত আমিষের তুলনায় অনেক বেশী। আর তাই সুষম খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন শতকরা ২০ ভাগ প্রাণিজ আমিষ থাকা দরকার। এ দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রয় ক্ষমতা। ফলে তারা ধীরে ধীরে ভাতের উপর চাপ কমিয়ে নন-কার্বোহাইড্রেট উপাদানের দিকে ঝুঁকছে। যার ফলে প্রতিবছর জনপ্রতি চালের চাহিদা ১.৫ কেজি হারে হ্রাস পাচ্ছে। ভাতের উপর নির্ভরতা কমানোর এই হার জাপান-কোরিয়ার উন্নয়নকালীন সময়ের হারের সমান। দেশে বর্তমানে মাংসের কনজাম্পশন গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৩৩% এবং শহরাঞ্চলে প্রায় ৪০% এর অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৫ সালে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। আমরা এখন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায়। পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের তালিকায় নাম লেখাতে হলে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ প্রোটিনের আধিক্য বাড়াতে হবে। কারণ উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্নপূরণে সবার আগে প্রয়োজন স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি। প্রয়োজন পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং প্রাণিজ আমিষ। আরে এজন্য প্রথমে বাড়াতে হবে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন। এ লক্ষ্যে গবাদিপশু ও পাখির রোগবালাই নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজন আধুনিক ভেটেরিনারি চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং খামারের আধুনিক ব্যবস্থাপনা। এর ফলে গবাদিপশুর রোগ বালাই নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে মৃত্যু হার হ্রাস্ব করে উৎপাদন বৃদ্ধি কর তে হবে। এছাড়াও কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে

গবাদিপশুর উন্নয়ন করে বাড়াতে হবে দুধ ও মাংসের উৎপাদন, বাণিজ্যিক খামারে ডিমের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি খাতে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াতে হবে, বাড়াতে হবে পুষ্টি সচেতনতা। ফলে উৎপাদন ও আয় বাড়লে বাড়বে ক্রয় ক্ষমতা, পুষ্টি সচেতনতা বাড়লে বাড়বে Dietary Diversification। এর ফলশ্রুতিতে দুধ, মাংস, ডিম হবে বাঙ্গালীর খাদ্যতালিকার অন্যতম উপাদান।

৫.২ পশুপাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কার্যক্রম

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল জলবায়ু পরিবর্তন, গবাদিপ্রানি ও হাঁস-মুরগীর বিভিন্ন রোগ এবং পুষ্টির অপ্রতুলতা। তন্মধ্যে গবাদিপ্রাণির উৎপাদনে বিভিন্ন প্রাণি রোগের আক্রমন সবচেয়ে বড় বাধা। বিভিন্ন গবেষনায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রাণি রোগের কারনে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী গড়ে ২০% উৎপাদন ক্ষতি হয় এবং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এর পরিমান ৩৫-৫০% (Fitzpatrick, 2013)। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন হ্রাসের জন্য দায়ী প্রাণিরোগগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ যথা ক্ষুরা, তড়কা, বাদলা, হাঁস-মুরগীর রানীক্ষেত, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডাক-প্লেগ, ছাগলের পিপিআর ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। আর তাই গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। প্রাণিরোগ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক রোগ নির্ণয় কার্যক্রম জোরদারকরন, প্রাণির চলাচল ব্যবস্থাপনা ও টিকা প্রদান কার্যকর রোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও সরকারি প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণের মাঝে প্রাণিরোগ সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। প্রাণিরোগ আইন ও কোয়ারেন্টাইন আইন অনুমোদিত হয়েছে। প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রনের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হল গবাদিপ্রাণিকে রোগ প্রতিরোধ টিকা প্রদান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এলআরআই) ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএলআরআই) থেকে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭ প্রকার টিকা উৎপাদন করা হয়। তবে প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উৎপাদিত টীকার পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় একবারেই অপ্রতুল। প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এলআরআই) হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট ১২৬.৫২ লক্ষ টিকা উৎপাদতি হয়। আর তাই ক্ষেত্র বিশেষে চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে জরুরী প্রয়োজনে প্রতিবছর বিদেশ থেকে টিকা সংগ্রহ করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির এ সব টিকা প্রদানের ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ গবাদিপ্রাণি-পাখি সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে এবং দেশের শত শত কোটি টাকার প্রাণিসম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। লেখচিত্র-৩ এর মাধ্যমে ২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে বছরভিত্তিক গবাদিপশু এবং পোল্ট্রিকে টিকা প্রদানের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তবে টিকা উৎপাদন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে দেশের সকল প্রাণিকে টিকা প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। ক্ষেত্র বিশেষে সক্ষমতা থাকা স্বত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বল্প টীকা উৎপাদনের অন্যতম একটি কারণ হলো , সরকারী বাজেটের সীমাবদ্ধতা/অপ্রতুলতা। এ খাতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাজেট ছিল ৫ কোটি টাকার কাছাকাছি। এত কম পরিমা ণ বরাদ্দ দিয়ে মোট পশু -পাখির শতকরা ১০ ভাগের বেশি ভ্যাকসিন তৈরি করা যায় না। এতে করে দেখা যায় এ দেশের পশু-পাখির প্রায় ৯০% অরক্ষিত অবস্থায় থাকে (সূত্র:http://www.khamarbd.com)। তাই প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মানসম্মত ও পর্যাপ্ত ভ্যাক্সিন উৎপাদনের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্বুধকরণ ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

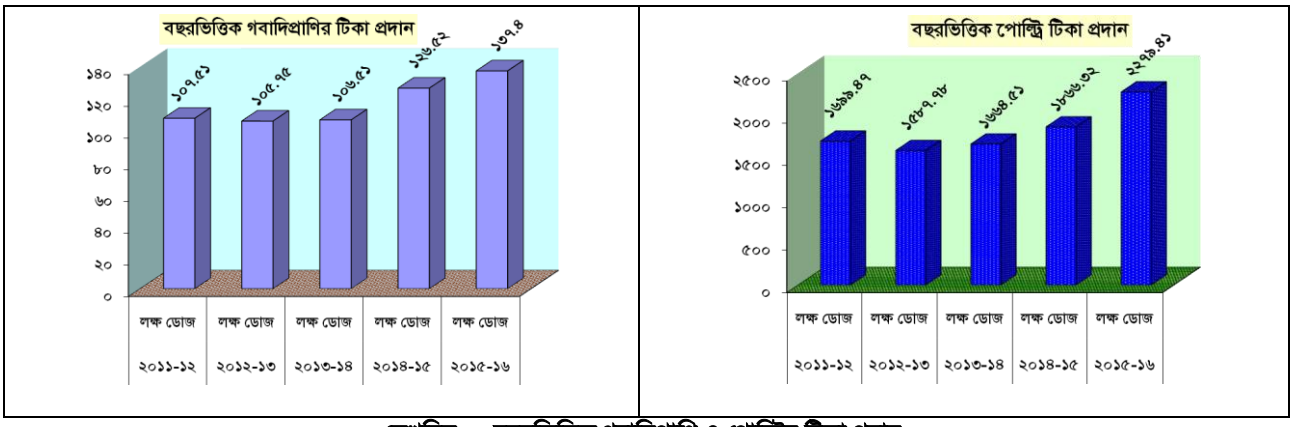

লেখচিত্র-৩: বছরভিত্তিক গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রির টিকা প্রদান

৫.৩ প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা

প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্য সেবা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের জন্য রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোগ নির্ণয় সঠিকভাবে না করতে পারলে রোগের সুচিকিৎসা করা এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও দেশের প্রতিটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে রোগ নির্ণয়ের প্রাথমিক সুবিধাদি বিদ্যমান। দেশে সকল জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের জন্য মিনি ল্যাবরেটরি প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া দেশে সাতটি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান ল্যাবরেটরী (এফডিআইএল) চালু রয়েছে এবং অপর ৫ নতুন এফডিআইএল (খুলনা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও দিনাজপুর) প্রস্তাব করা হয়েছে। রোগ নির্ণয়ের জন্য ঢাকায় আধুনিক সুবিধাসহ একটি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান ল্যাবরেটরি (সিডিআইএল) রয়েছে। বর্তমানে অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সিডিআইএলের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে রোগের ধরন, উৎস এবং ব্যাপকতা সদা পরিবর্তনশীল। এমতাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সিডিআইএলসহ অন্যান্য সকল এফডিআইএলসমূহের আধুনিকায়ন এখন সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় বিভিন্ন কৌশল সংযুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে বেসরকারি পর্যায়ে ভেটেরিনারি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় কার্যক্রমকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে প্রাণি**উৎসের রোগ প্রতিরোধ এবং দমনের** কৌশল হিসাবে সারাদেশে বেসরকারিভাবে ভেটেরিনারি ক্লিনিক স্থাপন সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

রোগ-ব্যধি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের একটি অন্যতম অন্তরায়। প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের অধীন বর্তমানে দেশের প্রতিটি জেলায় ভেটেরিনারি হাসপাতাল রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং এই দপ্তর হতে প্রাণিসম্পদ চিকিৎসা সেবা , রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, গবাদিপশুর ভ্যাক্সিন প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে আরো ১০টি মেট্রো প্রাণিসম্পদ চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি উপজেলা, জেলা হাসপাতাল এবং কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানগন চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সকল হাসপাতালে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সেবা প্রদান ছাড়াও চিকিৎসকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সরেজমিন গিয়ে চিকিৎসা, পরামর্শ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন। উপজেলা সদরের বাইরে প্রতিটি উপজেলায় গড়ে ৩টি সেবাকেন্দ্র পরিচালিত হয়। এ সেবা কেন্দ্রগুলিতে একজন মাঠকর্মী প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকেন। লেখচিত্র-৪ এর মাধ্যমে দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে বছরভিত্তিক

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র/হাসপাতাল সমূহ হতে গবাদিপ্রাণি এবং পোল্ট্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান/গ্রহনের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, অপ্রতুল জনবল, সাপোর্ট সার্ভিসের অভা ব ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা গেলে দেশের অধিকাংশ রোগাক্রান্ত গবাদিপ্রাণি ও পাখির চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভব। আর তাই প্রস্তাবিত প্রাণি**উৎসের রোগ প্রতিরোধ এবং দমনের** কৌশল হিসাবে বেসরকারি পার্যায়ে ভেটেরিনারি সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভেটেরিনারি পরামর্শ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে।

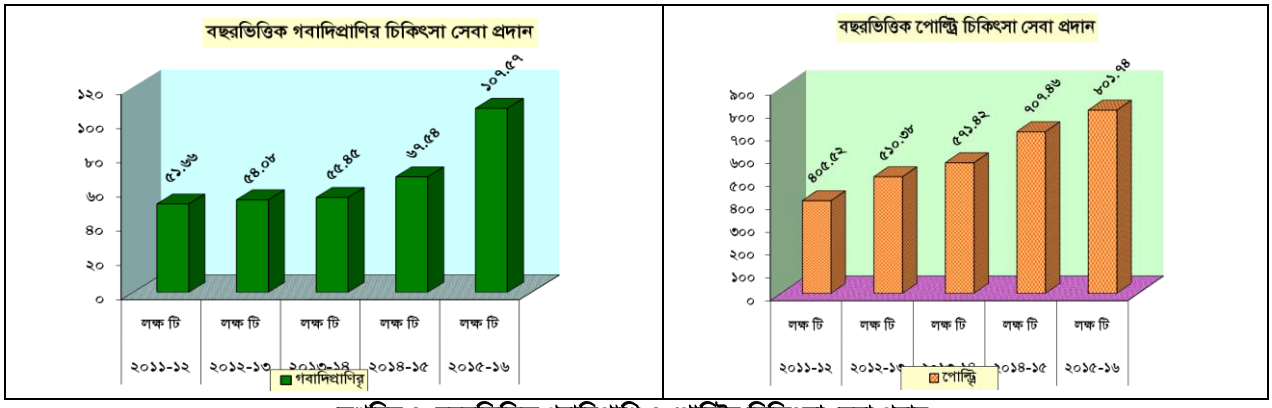

লেখচিত্র-৪: বছরভিত্তিক গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রির চিকিৎসা সেবা প্রদান

৫.৪ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরাসরি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির সাথে দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে গ্রামীণ মানুষের 'গরিবের ব্যাংক' বলা হয়ে থাকে প্রাণিসম্পদ খাত বিশেষ করে গরু , ছাগল ও মোষগুলোকে। দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রাণিসম্পদ বিভাগের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিগত পাঁচ বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রায় ৫০.১৭ লক্ষ জন (বেকার যুবক, যুব মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক) কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উঠান বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানে দেশে ক্ষুদ্রাকৃতির গবাদি খামার পালনে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন নারীরা। ফলে গবাদিপশু পালন বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দ্বারা গ্রাম্য নারীদের আয় বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে, যা বাস্তবায়িত হলে বেসরকারী পর্যায়ে প্রাণিসম্পদের ব্যাপক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র হ্রাসকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

৫.৫ প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তির প্রয়োগ অন্যতম অনুষঙ্গ। তবে কৃষি সেক্টরের তুলনায় এ সেক্টরে উন্নয়নের চাহিদা মোতাবেক উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার তুলনামুলকভাবে কম। কিছু কিছু নব প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে আশার আলো দেখাচ্ছে। যেমন: কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে একটি উত্তম ষাঁড় থেকে যেমন অসংখ্য গাভীকে প্রজননের মাধ্যমে অগণিত উন্নত সংকর বাছুর পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি প্রযুক্তির প্রয়োগ তথা তরল নাইট্রোজেনে সিমেন হিমায়িতকরণের ফলে উক্ত উন্নত ষাঁড়ের মৃত্যুর পরও বছরের পর বছর তার

প্রজন্ম উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। পারিবারিক পর্যায়ে ১ কিংবা ২ লিটার দুধ হচ্ছে এমন গাভী দোহনে প্রযুক্তি নিয়ে না ভাবলেও চলে। কিন্তু কৃত্রিম প্রজননের ফলে উন্নত সংকর গাভী দৈনিক ১০ থেকে ২৫ লিটার পর্যন্ত দুধ দিচ্ছে। কোন খামারে যদি এমন গাভী যথেষ্ট সংখ্যায় থাকে, তবে দুগ্ধ দোহনের সময় নিয়ে তাকে ভাবতেই হয়। ভাবতে হয় প্রযুক্তি নিয়ে। আছে মিল্কিং মেশিন প্রযুক্তি। বাঁচিয়ে দেবে সময় ও শ্রম। অনুরূপভাবে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য সংযোজন, বিপণন প্রতি পরতে পরতে রয়েছে প্রযুক্তির প্রয়োগ। প্রযুক্তি জটিল কাজকে সরল, অসম্ভবকে সম্ভব করে। সময়, শ্রম ও অর্থ বাঁচায়। উৎপাদন খরচ কমায়, গুণ ও মানকে উন্নত করে। প্রয়োজন শুধু লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। নিম্নে কিছু প্রযুক্তির নাম উল্লেখ হলোঃ

- প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা উন্নয়নে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ
- ELISA ভিত্তিক ক্ষুরারোগ নির্ণয় পদ্ধতি
- পিপিআর ও রিন্ডারপেষ্ট রোগ নির্ণয়ে EISA পদ্ধতি
- পিপিআর ও সালমোনেলা ভ্যাকসিন উদ্ভাবন ও ব্যবহার ইত্যাদি।
- গবাদিপশুর কৃমিরোগ দমন মডেল
- পিপিআর রোগের সমন্বিত চিকিৎসা
- বাণিজ্যিক খামারে মুরগির জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা
- স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ
- ক্ষুদ্র খামারীদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার পালন মডেল
- স্ল্যাট/স্টল পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন
- গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন প্রযুক্তি
- পারিবারিক পর্যায়ে কোয়েল/ককরেল/খরগোশ পালন প্রযুক্তি
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ যথা: সাইলেজ পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ, ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র এবং গো-খাদ্য হিসাবে অ্যালজি, কলাগাছের উৎপাদন ও ব্যবহার

এছাড়াও Urea Treated Straw (UTS), Urea Mollases Multi Nutrient Block (UMMB), Mechanical Straw Bailing, UMS mixing Machine, Grass Chopping, Densified Total Mixed Feed (DTM Feed), Biogas Technology, Milking Machine, Cream Separation, Household Butter Manufacturing, Non Electric Chick Brooder, Beef Fattening, Farm waste Management, Primary Milk Processing, Broiler Rearing, Layer Rearing, Calf Rearing, Duck Rearing, Hydroponic Fodder ইত্যাদি বহু প্রযুক্তি রয়েছে যেগুলো আরও যুগোপযোগী করা হয়েছে। বিএলআরআই থেকে স্বর্ণ ও শুভ্রা জাতের ডিম পাড়া মুরগি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সিপিএফ লেয়ার ও ব্রয়লার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাউ ব্রো হোয়াইট ও বাউ ব্রো কালার ব্রয়লার জাত উদ্ভাবিত হয়েছে।

৫.৬ গবাদিপশুর গো-খাদ্য উৎপাদন ও বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার কার্যক্রম বৃদ্ধি

দেশে দুধ এবং মাংশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে পশুখাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এক হিসাব হতে জানা যায় যে , গবাদিপশুর খামারে যে খরচ হয় তার প্রায় ৭০ ভাগই খাদ্য খরচ। কিন্তু বাংলাদেশে রয়েছে গো-খাদ্যের খুব অভাব। ঘনবসতিপূর্ণ এদেশে যে জমি আছে তা দিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রায় সমস্ত জমিই মনুষ্য খাদ্য-শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে গো-খাদ্য উৎপাদনে আর কোনো জায়গা থাকছে না। আর তাই দেশে চারণ ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকার ফলে চারণ ভূমিতে গবাদিপশু চরে যৎসামান্য পরিমাণে কাঁচা ঘাস খেতে পারে। আর কৃষক ভাইয়েরা ফসলা জমিতে ঘাস চাষ করে গরুকে খাওয়াতে তেমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করেন না। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে , দুধেল গাভীর জন্য কাঁচা ঘাসের কোন বিকল্প নেই। কারণ গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস সরবরাহ করলে খামারী অনেকভাবে লাভবান হন যথা: অধিক দুধ পাওয়া যায়, খাদ্য খরচ কম হয়, সুস্থ্য-সবল বাছুর জন্ম দেয়, কৃত্রিম প্রজননের সফলতা পাওয়া যায়, সঠিক বয়সে যৌন পরিপক্কতা আসে, জন্মের সময় বাচ্চার মৃত্যু হার খুবই কম হয়, দানাদার খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হয় ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যায়, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে যে বাছুর জন্ম নেয় তার দৈহিক ওজন কাংখিত মাত্রায় পাওয়া যায়, লাভ বেশী হয় ফলে কৃষক গাভী পালনে উৎসাহিত হয়, উন্নত জাতের একটি গাভী পালন করে ছোট একটি সংসার চালনো যায় ফলে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হয়, রোগ-ব্যাধি কম হয় ফলে চিকিৎসা খরচ খুবই কম হয়, ঔষধ খরচ কম হয়, গাভীর মৃত্যু হার খুবই কম হওয়াতে আর্থিক ক্ষতি হয় না, দুধ উৎপাদন বেশী হলে গরিব কৃষক দুধ বিক্রয়ের পাশাপাশি নিজেরাও দুধ খেয়ে থাকে ফলে তাদেরও স্বাস্থ্য সুস্থ্য থাকে, এক একর জমিতে ধান চাষ করে যে লাভ পাওয়া যায় ঘাস চাষ করলে তার চেয়ে কয়েক গুন বেশী লাভ পাওয়া যায়

বাংলাদেশে বর্তমানে কাঁচা ঘাস চাষের আওতাধীন জমির পরিমান মাত্র ৩৬ হাজার একর। অর্থাৎ মোট শস্য চাষ এলাকার শতকরা এক ভাগের মাত্র এক দশমাংশ এলাকায় ঘাসের চাষ হচ্ছে। বর্তমানে পশুখাদ্য হিসাবে যেখানে কাঁচা ঘাসের চাহিদা ৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন, সেখানে দেশে উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ২৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অর্থাৎ কাঁচা ঘাসের মোট ঘাটতির পরিমান প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগ। ফলে কাঁচা ঘাস চাষের তীব্র সংকটকাল অতিক্রম করছে দেশের প্রাণিসম্পদ শিল্প। আর দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কাঁচা ঘাসের উৎপাদন কম হওয়ার কারণে , সুষম খাদ্যের অভাব পূরণের লক্ষ্যে খামারীরা ভূষি বা অন্য বিকল্প খাদ্য উৎসকে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। যদিও দেশে গম ও ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন মোটেও আশানুরূপ নয়। ফলে ভূষি উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেক কম হয়। এ কারণে বাজারে ভূষির দাম সবসময় অত্যধিক থাকে। যদি আঁশ জাতীয় খাদ্য যেমন খড় ও দেশী ঘাস সে তুলনায় বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হলেও কৃষক ভাইয়েরা সে সবের সংরক্ষণ পদ্ধতির বিষয়ে তেমন ওয়াকিবহাল নন। ফলে এ জাতীয় খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশ পচে নষ্ট হয়ে যায়।

আর তাই দেশের গো-খাদ্যর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুদিন ধরেই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কাজ চলছে যথা: সাইলেজ পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ, ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র। রয়েছে Urea Treated Straw (UTS), Urea Molases Multi Nutrient Block (UMMB)। একইসাথে গো-খাদ্য হিসাবে আধুনিক অনেক পদ্ধতিই ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে বহুল আলোচিত বিকল্প গো-খাদ্যের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তিগুলো হলো নিম্নরুপ:

ক) **ভূট্টা খড়ের সংরক্ষন ও ব্যবহার**

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা বিভাগে প্রচুর ভুট্টা চাষ হয়। শুধুমাত্র রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগে ২২,১১০ হেক্টর জমিতে ভূট্টা চাষ করা হয়। এক চতুর্থাংশ জায়গার ভূট্টার খড়ও যদি সাইলেজ করা হয় তা হলে মোট ৮,৮৪,৪০০ টন সাইলেজ উৎপাদন করা সম্ভব। এই বিপুল পরিমাণ উচ্ছিষ্ট সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে পশু খাদ্যের অভাব দূরীকরণসহ পশুজাত উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বহুলাংশে কমানো যায়। আর ভূট্টা খড় ব্যবহারের যে সকল সুবিধা রয়েছে তা হ'ল:

- অধিক উৎপাদনশীল। ভুট্টা দানা ও খড় একই সংগে আহরণ করা যায়। তাছাড়া হাইব্রিড ভুট্টার খড় ভুট্টাদানা সংগ্রহের পরও সবুজ ও সতেজ থাকে ফলে খড়ের পুষ্টিমানও ভাল থাকে।
- ভুট্টা রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) ও খরিপ (মার্চ-অক্টোবর) উভয় মৌসুমেই জন্মে। তাই ভুট্টার খড় হতে বছরে দুই বার সাইলেজ করা যায় এবং সারা বছর পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- কোন রকম দ্রব্যাদি যোগ করা ছাড়াই ভুট্টা খড়ের সাইলেজ তৈরী করা যায় তবে মোলাসেস অথবা ইউরিয়া যোগ করে সাইলেজ তৈরী করলে সাইলেজের পুষ্টিমানও বাড়ে এবং অধিককাল সংরক্ষণ করা যায়।
- হাইব্রিড ভুট্টা হতে রবি ও খরিপ মৌসুমে প্রতি হেক্টরে দানা উৎপন্ন হয় যথক্রমে ৬-১০ টন ও ৪-৫ টন। তাছাড়া প্রতি ঋতুতে প্রতি হেক্টরে ভুট্টার খড় উৎপন্ন্ হয় ২৫-৫০ টন। এই খড় সাধরনত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি ব্যবহার করে উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য তৈরী করা যায়।
- দেশের মোট ভুট্টা উৎপাদন এলাকার যথাক্রমে ৫৪ শতাংশ (১৫ লক্ষ হেক্টর)এবং ২৫ শতাংশ (৭ লক্ষ হেক্টর) এলাকা রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। তাই এ সমস্ত এলাকায় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভুট্টা দানা ও খড় ব্যবহার করে ডেইরী, বীফ, লেয়ার, ব্রয়লার ও ছাগল উৎপাদন সম্ভব।

খ) খামারের বর্জ্য হতে ডাকউইড উৎপাদন ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার

ডাকউইড এক ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতির ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ যা বদ্ধ স্রোতহীন জলাশয়ের উপর দলবদ্ধ ভাবে ভেসে থাকে। ডাকউইডকে ভ্রমবশত অনেকে '' শেওলা'' মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষেএরা সপুস্পক উদ্ভিদ অর্থাৎ এদের ফুল হয়। সপুস্পক উদ্ভিদ হলেও প্রকৃতিতে ডাকউইড প্রধানত ''কুড়ি'' উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে এবং এত দ্রুত বিভাজন হয় যে, আদর্শ পরিবেশে ৮-১৬ ঘন্টার মধ্যে এক কেজি ডাকউইড দুই কেজিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ডাকউইডের পুষ্টিমানও যথেষ্ট। ডাকউইডে ৪০% পর্যন্ত আমিষ থাকতে পারে । মানবদেহের ও পশুপাখির জন্য আবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড গুলোর অধিকাংশ ডাকউইডে আছে। এছাড়া ডাকউইডে পর্যাপ্ত পরিমানে ভিটামিন ''এ'' ও ''ডি'' বিদ্যমান। এজন্য ডাকউইডকে মাছ ও পশু-পাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

পশুখাদ্য হিসাবে ডাকউইডের ব্যবহার

- সবুজ ঘাসের বিকল্প হিসাবে গরুর খাদ্যে ডাকউইড ব্যবহার করা যায়। একটি গরু দৈনিক ১০-১২ কেজি কাঁচা ডাকউইড খেতে পারে। এক্ষেত্রে কুড়া বা ভূষির সাথে প্রতি কেজি ডাকউইডের ১০০ গ্রাম পরিমান মোলাসেস মিশাতে হয়। এতে গরুর মাংস ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

- খামারে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবহারে ডাকউইডের উৎপাদন এবং পশুখাদ্য হিসাবে এর ব্যবহার খাদ্য খরচ বহুলাংশে কমিয়ে দিতে পারে।

গ) গো- খাদ্য হিসাবে এ্যালজির উৎপাদন ও ব্যবহার

এ্যালজি এক ধরনের উদ্ভিদ যা আকারে এককোষী থেকে বহুকোষী বিশাল বৃক্ষের মত হতে পারে। তবে আমরা এখানে দুটি বিশেষ প্রজাতির এককোষী এ্যালজি ক্লোরেলা ও সিনেডেসমাস নিয়ে আলোচনা করবো যা গো- খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এরা সূর্যালোক, পানিতে দ্রবিভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জৈব নাইট্রোজেন আহরন করে সালোক সংশ্লেষন প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকে। এরা অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উষ্ণ জলবায়ুতে।

এ্যালজির পুষ্টিমান

বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত খাদ্যের মধ্যে এ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর খাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন- খৈল, শুটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক এ্যালজিতে শতকরা ৫০ - ৭০ ভাগ আমিষ বা প্রোটিন থাকে, ২০ - ২২ ভাগ চর্বি এবং ৮ - ২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়াও এ্যালজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন বি থাকে। কেবল মাত্র ''সিসটিন'' ছাড়া এ্যালজির প্রোটিনে বিভিন্ন ধরনের এ্যামাইনো এসিডের অনুপাত প্রায় ডিমের প্রোটিনের সমান। রোমন্থনকারী প্রাণীতে (যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) এ্যালজির প্রোটিনের পাচ্যতা ৭৩%।

এ্যালজি খাওয়ানোর উপকারীতা

রোমন্থনকারী প্রাণী যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যে ঘাস বা খড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে তা পাকস্থলীর জীবাণু দ্বারা ভেঙ্গে হজম হয়। এই জীবাণুর পরিমাণ এবং কার্যক্রম খাদ্যের উপর নির্ভর করে। যদি ভাল মানের খাদ্য অর্থাৎ পরিমাণ মত প্রোটিন, সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এবং খনিজ যুক্ত খাবার খায় তা হলে এই জীবাণুর পরিমাণ ও কার্যক্রম বেড়ে যায় তথা গরুতে প্রোটিন এবং বিপাকীয় শক্তি সরবরাহ বেড়ে যায়। আবার যদি নিম্নমানের খাদ্য যেমন- খড় খায় তবে গরু তার চাহিদা মত বিপাকীয় শক্তি ও প্রোটিন পায় না। তাই শুধু খড় খাওয়ালে গরুর উৎপাদন কমে যায়। খড়ের সাথে সাধারণ পানির পরিবর্তে এ্যালজির পানি খাওয়ালে বাড়ন্ত গরুর মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সরবরাহ বেড়ে যায় এবং গরুর দৈহিক ওজন হ্রাস অনেক কমে যায়। আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই কাঁচা ঘাসের অভাব প্রকট। বিশেষ করে শহর এলাকায় এ সমস্যা তীব্রতর। এর ফলে গরুর ভিটামিন এবং খনিজের অভাব জনিত রোগ যেমন- অন্ধত্ব, রাতকানা,গাভীর অনুর্বরতা ইত্যাদি দেখা যায়। যেহেতু এ্যালজিতে প্রচুর পরিমানে বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ থাকে, তাই এ্যালজি খাওয়ানোর ফলে গরুকে এসব পুষ্টির অভাব জনিত রোগ থেকে রক্ষা করা যায়।

ঘ) Hydroponic Fodder:

এটি একটি সর্বাধুনিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোন প্রকার জমি ছাড়াই শুধু পানি প্রয়োগ করে গম বা ভুট্টার বীজ থেকে সবুজ ঘাস উৎপন্ন করেছেন। তাও আবার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তা পশুকে খাওয়াতে পারবেন। এই প্রযুক্তির ব্যবহারে পশুখাদ্য উৎপাদনে খরচও কম। এই খাদ্যে বাজারের দানাদার ও মাঠের সবুজ ঘাসের প্রায় সব পুষ্টি উপাদান আছে।

হাইড্রোফনিক ফডার খাওয়ানোর উপকারিতা

গবেষণায় দেখা গেছে, গাভীকে আঁশ জাতীয় খাদ্যের ৪০-৫০% হাইড্রোফনিক খাদ্য খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রায় ১০-১৫% দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এ ফডার খাওয়ার মাধ্যমে গাভীর ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ হার বৃদ্ধি পায়। এটি গাভীর আঁশ জাতীয় খাদ্যের পাশাপাশি উদ্ভিজ আমিষ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ লবণের উৎস হিসাবে কাজ করে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, হাইড্রোফনিক ফডার গাভীকে খাওয়ালে ৩ লিটার পর্যন্ত দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে পাশাপাশি দুধের ফ্যাট ও এসএনএফ (সলিড নট ফ্যাট) পর্যায়ক্রমে ০.৩%-০.৫% বৃদ্ধি পায়।

দেশের গো -খাদ্যের এ সমস্যা উত্তরণের জন্য প্রয়োজন উচ্চ ফলনশীল ঘাসের আরো বেশী বেশী চাষ যথা : নেপিয়ার, নেপিয়ার পাকচং, পারা, জাম্বো, গিনি, জার্মান, ভূট্রা ইত্যাদি। বর্তমান বহুল ব্যব হৃত এবং আধুনিক যে সকল প্রযুক্তি রয়েছে সেগুলো আরও যুগোপযোগী করা এবং একইসাথে এ সকল প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, সংশ্লিষ্ট কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপনকরত: উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের উপর জোর প্রদান করা।

৫.৭ প্রাণিসম্পদ ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

দেশের বেশীর ভাগ প্রান্তিক খামারীরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য, বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে ১টি বা ২টি গরু বা ছাগল পালন করে। তাই পারিবারিক পর্যায়ে হোক, আর ক্ষুদ্র কিংবা মাঝারী পর্যায়ের হোক, গবাদিপশু কিংবা হাঁস-মুরগি লালন-পালনের জন্য তাদের তহবিলের প্রয়োজন হয়। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বেকার যুবক-যুবতী, বিধবা কিংবা সধবা, দুস্থ কিংবা অসহায়, যদি তাদের আরো উদ্যোগী করা যায়, দেয়া যায় এতটুকু তহবিল সরবরাহ, হোক না তা ক্ষুদ্রঋণ, তাতেই শুরু। প্রাণিসম্পদের পলিসি এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় Access to Credit এবং Access to Insurance বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বেকার যুবক ও যুব মহিলা, দুঃস্থ পরিবার, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষীদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে ''প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)''-এর মাধ্যমে ২৫.০৪ কোটি টাকা ও ''প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)''-এর মাধ্যমে ৮.৬৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ''দারিদ্র বিমোচনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম (ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগী) কর্মসূচী''-এর মাধ্যমে ৪৪০ টি উপজেলায় ৩২.৯৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রণীত কার্যনির্দেশিকা-২০১১ অনুসারে পুন: ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, বাংলাদেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে দুগ্ধ খামারীদের মাত্র ৫% সরলসুদে ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে পুন:অর্থায়ন কর্মসূচী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১৩ই জানুয়ারী, ২০১৬ খ্রি: উদ্বোধন করা হয়েছে এবং ১২টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫.৮ প্রাণিসম্পদ আইন ও বিধি পর্যালোচনা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং বিদ্যমান

বেশকিছু আইন ও বিধি যেমনঃ

পশুরোগ আইন, ২০০৫ ও তদাধীনে প্রণীত পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮;

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও তদাধীনে প্রণীত পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩;

পশু ও পশুজাত পণ্য সংগনিরোধ আইন, ২০০৫;

পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১;

The Bengal Cruelty to Animals Act, 1920 এবং

The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982 রয়েছে।

৫.৮.১ পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১

১। জবাইখানার বাহিরে কোন পশু জবাই করা যাবে না ।

২। পরিবেশ দূষণ করা যাবে না । বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

৩। জবাই নিষিদ্ধ পশু জবাই করা যাবে না ।

৪। জবাই নিষিদ্ধ দিবস মানতে হবে।

৫। জবাইয়ের পূর্বে ও পরে ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক পশু যথাযথ পরীক্ষা করা।

৬। বিধি অনুযায়ী জবাইখানার পরিবেশ ও মান নির্ধারণ করা।

৭। বিধি অনুযায়ী জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা স্থাপন করতে হবে।

৮। বিধিবদ্ধ সংস্থা ধারা লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা স্থাপন করতে পারবে না।

৯। জবাইখানা ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কর্মী ও মাংস বিক্রেতার স্বাস্থ্য সনদপত্র সংরক্ষণ করবে ও ভেটেরিনারিয়ানকে প্রদর্শণ করতে বাধ্য থাকবে।

১০। ভেটেরিনারিয়ান কোন পশু জরুরী ভিত্তিতে জবাইয়ের নির্দেশ দিতে পারেন।

১১। কারকাস বা অফাল মানুষের ভক্ষন ব্যতীত অন্য কাজে উপযুক্ত হলে ভেটেরিনারিয়ান তা ব্যবহারের বা হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করতে পারে।

১২। ভেটেরিনারিয়ান পশু বা মাংস বা মাংসজাত পণ্য বা যানবাহন আটক বা বিধি অনুযায়ী অপসারণ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

৫.৮.২ পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮

পশু রোগ আইন, ২০০৫ এর ধারা ৩১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই বিধিমালা প্রণীত হয়েছে এবং এই বিধিমালার

বিধি-২ এ বিভিন্ন সংগা;

বিধি-৩ এ পশু রোগেসমূহের শ্রেণীবিন্যাস ও অবহিতকরণ;

বিধি-৪ এ পশু রোগ ও সংক্রামিত স্থান সম্পর্কে তথ্য;

বিধি-৫ এ রোগাক্রান্ত পশু পৃথকীকরণ ও গৃহিতব্য ব্যবস্থা;

বিধি-৬ এ সংক্রামক এলাকা ঘোষণার বহুল প্রচার;

বিধি-৭ এ সংক্রামিত এলাকার ভিতরে রেলওয়ে বা অন্যকোন যানবাহনে পশু ও পশুজাত পণ্য পরিবহনের শর্তাবলী;

বিধি-৮ এ টিকাদান পদ্ধতি;

বিধি-৯ এ পশু রোগ পরীক্ষার জন্য নমূণা সংগ্রহ;

বিধি-১০ এ পোস্টমর্টেম পরীক্ষা;

বিধি-১১ এ রোগাক্রান্ত মৃত অথবা জীবিত পশু অপসারণ;

বিধি-১২ এ সংক্রামিত এলাকায় পশু বাজারজাতকরণ পদ্ধতি;

বিধি-১৩ এ সংক্রামিত এলাকায় পশুজাত পণ্য বাজারজাতকরণ;

বিধি-১৪ এ কাঁচা বাজারে পশু, পাখি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়;

বিধি-১৫ এ রোগাক্রান্ত হাঁস-মুরগি ও উহার ডিম, বা উহার বাচ্চা ধ্বংসকরণ পদ্ধতি;

বিধি-১৬ এ পশু জব্দকরণ পদ্ধতি,;

বিধি-১৭ এ মালিকের নিকট জব্দকৃত পশু ফেরত প্রদানের পদ্ধতি;

বিধি-১৮ এ পশু হাসপাতাল, গবাদিপশুর খামার ইত্যাদি নিবন্ধনের পদ্ধতি ও শর্তাবলী;

বিধি-১৯ এ নিবন্ধনের মেয়াদ, নবায়ন, ফিস ইত্যাদি;

বিধি-২০ এ প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত সময়;

বিধি-২১ এ অর্থ জমাদান; সংক্রান্ত উপবিধিসমূহ রয়েছে।

পশু রোগ বিধিমালার

তফসিল-১ এ পশু রোগের শ্রেনীবিন্যাস;

তফসিল-২ এ রোগের নাম, রোগের কারণ, রোগের বিস্তার, সুপ্তিকাল এবং পৃথকীকরণের ধরণ ও সময়;

তফসিল-৩ এ বিভিন্ন রোগ পরীক্ষার জন্য সংগৃহিতব্য নমূণা;

তফসিল-৪ এ বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টকৃত পরীক্ষা;

তফসিল-৫ এ হাঁস-মুরগির ব্রিডিং ও হ্যাচারীরর বিভিন্ন রোগ ও আক্রান্ত পশু ধ্বংসের পদ্ধতি;

তফসিল-৬ এ নিবন্ধন প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

তফসিল-৭(ক) এ দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খুচরা বিক্রয় স্থাপনা পরিচালনার শর্তাবলী;

তফসিল-৭(খ) এ গবাদিপশুর শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্রূণ উৎপাদন ও স্থানান্তর, দাতা গাভী, ষাঁড়, পাঁঠা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্রিডিং সেন্টার পরিচালনার জন্য আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের শর্তাবলী;

তফসিল-৭(গ) এ গ্রান্ড গ্রান্ড প্যারেন্ট/গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপনের শর্তাবলী;

তফসিল-৭(ঘ) এ প্যারেন্ট খামার স্থাপনের শর্তাবলী;

তফসিল-৭(ঙ) এ বাণিজ্যিক খামার (জিপি ও পিএস বাদে) স্থাপনের শর্তাবলী;

তফসিল-৭(চ) এ বেসরকারি ভেটেরিনারি ল্যাবরেটরী স্থাপনের শর্তাবলী;

তফসিল-৭(ছ) মাংস প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের শর্তাবলী;

তফসিল-৭(জ) এ মাংসের হাড় ছড়ানো ও প্যাকিং প্যাটেন্ট পরিচালনার শর্তাবলী;

তফসিল-৭(ঝ) এ বেসরকারি ভেটেরিনারি হাসপাতাল স্থাপনের শর্তাবলী;

তফসিল-৭(ঞ) এ বেসরকারি সাপের খামার স্থাপনের শর্তাবলী;

তফসিল-৭(ট) এ বেসরকারি কুমিরের বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের শর্তাবলী; বর্ণিত রয়েছে।

এছাড়াও পশু রোগ বিধিমালায় বর্ণিত

ফরম-১ এ রোগ ও সংক্রমিত স্থাপন সম্পর্কিত তথ্যাবলী;

ফরম-২ এ সংক্রামিত এলাকার ভিতর দিয়া পশু পরিবহণের নিমিত্ত স্বাস্থ্য সনদপত্র;

ফরম-৩ এ সংক্রামিত এলাকার মধ্য দিয়া পরিবহণকৃত পশুর ছাড়পত্র;

ফরম-৪ এ পোস্টমর্টেম;

ফরম-৫ এ টিকা প্রদানের সনদপত্র;

ফরম-৬ এ জব্দকৃত পশুর রেজিস্টার;

ফরম-৭ এ জব্দকৃত পশুর জন্য ব্যয় রেজিস্টার;

ফরম-৮(ক) এ পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদন পত্র;

ফরম-৮(খ) এ শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা/গরম বা মহিষের ষাঁড়/পাঁঠা/দাতা গাভী/ছাগী পালনের খামার (ব্রিডিং খামার) স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র;

ফরম-৮(গ) এ গ্রান্ড প্রান্ড প্যারেন্ট স্টক/ গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র;

ফরম-৮(ঘ) এ হাঁস-মুরগির প্যারেন্ট স্টক/বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র;

ফরম-৮(ঙ) বেসরকারি পশু রোগ নির্ণয় গবেষনাগারের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র;

ফরম-৮ (চ) বেসরকারি পশু হাসপাতালের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র;

ফরম-৮(ছ) এ বিভিন্ন রোমন্থক প্রাণির বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র;

ফরম-৮(জ) এ কৃত্রিম প্রজনন কার্যে ব্যবহারের ষাঁড়ের উপযুক্ততার অনুমোদন ফরম;

ফরম-৮(ঝ) এ বেসরকারি সাপ/কুমিরের বাণিজ্যিক স্থাপন নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র; বিস্তারিত প্রদত্ত রয়েছে ।

৫.৮.৩ পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর ধারা ২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ অনুমোদন করেছে। এ আইনের উপধারা-১৪ এ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে উপধারা-১১ এ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের মান নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে, উপধারা-১২ এ ক্ষতিকর ও ভেজাল মৎস্যখাদ্য ও

পশুখাদ্য উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, পরিবহন ও বিপণন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উপধারা-১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ এ অপরাধ হিসেবে গণ্য করে দন্ড দেয়ার কথা বলা আছে।

পশুখাদ্য বিধিমালার

বিধি-২ এ বিভিন্ন সংগা;

বিধি-৩ এ লাইসেন্স এর জন্য আবেদন পদ্ধতি;

বিধি-৪ এ আবেদনকারীর ক্যাটাগরি এবং ফি, ইত্যাদি;

বিধি-৫ এ লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলকরণ;

বিধি-৬ এ আপীল ও পূণর্বিবেচনা;

বিধি-৭ এ পশুখাদ্যের আদর্শ মাত্রা;

বিধি-৮ এ পশুখাদ্য মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে নমূণা সংগ্রহ, মান নিয়ন্ত্রণ, ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ এবং ফি পরিশোধ, ইত্যাদি;

বিধি-৯ এ পাত্র ও লেভেলিং;

বিধি-১০ এ কারখানা বা সংশিস্নষ্ট স্থানে প্রবেশ, ইত্যাদি;

বিধি-১১ এ ক্ষতিকর ও ভেজাল পশুখাদ্য বিনষ্টকরণ, শোধন, ইত্যাদি; এর আওতায় উপবিধিসমূহ রয়েছে।

পশুখাদ্য বিধিমালায়

তফসিল-১ এ সহজলভ্য খাদ্য উপকরণের শ্রেণীবিন্যাস;

তফসিল-২ এ পশুখাদ্যে ব্যবহৃত প্রচলিত খাদ্যের মানের বর্ণনা;

তফসিল-৩ এ লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্ত;

তফসিল-৪(ক) এ ডিমপাড়া মুরগির পুষ্টির আদর্শ পরিমাণ;

তফসিল-৪(খ) এ ব্রয়লার মুরগির পুষ্টির আদর্শ পরিমাণ;

তফসিল-৪(গ) এ ব্রয়লার স্টার্টার ও ফিনিসার খাদ্যের ভিটামিনের আদর্শ পরিমাণ; বাড়ন্ত, ডিমপাড়া ও প্রজননের মুরগির খাদ্যের ভিটামিনের আদর্শ পরিমাণ;

তফসিল-৪(ঘ) এ লেয়ার গ্রোয়ার মুরগির খাদ্যের পুষ্টির আদর্শ পরিমাণ;

তফসিল-৪(ঙ) এ বিভিন্ন বয়সের বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগির পুষ্টি তালিকা;

তফসিল-৪(চ) এ বিভিন্ন বয়সের লেয়ার প্যারেন্ট স্টকের পুষ্টি তালিকা;

তফসিল-৪(ছ) এ বিভিন্ন বয়সের বাণিজ্যিক ব্রয়লার মুরগির পুষ্টি তালিকা;

তফসিল-৪(জ) এ বিভিন্ন বয়সের ব্রয়লার প্যারেন্ট স্টকের পুষ্টি তালিকা;

তফসিল-৫(ক) এ বাড়ন্ত ষাঁড় গরমের জন্য দৈনিক শক্তি ও প্রোটিন এর চাহিদা;

তফসিল-৫(খ)এ এ দুধালো গাভীর জন্য দৈনিক শক্তি ও প্রোটিন এর চাহিদা;

তফসিল-৬(ক) এ বাড়ন্ত মহিষের জন্য দৈনিক শক্তি ও প্রোটিন এর চাহিদা;

তফসিল-৬(খ) এ দুধালো মহিষের জন্য দৈনিক শক্তি ও প্রোটিন এর চাহিদা;

তফসিল-৭(ক) এ ছাগলের জন্য দৈনিক শক্তি ও প্রোটিন এর চাহিদা;

তফসিল-৭(খ) এ দুগ্ধবতী ছাগীর জন্য দৈনিক শক্তি ও প্রোটিন এর চাহিদা;

তফসিল-৭(গ) এ ভেড়ার জন্য দৈনিক শক্তি ও প্রোটিন এর চাহিদা;

তফসিল-৭(ঘ) এ ভেড়ীর জন্য দৈনিক শক্তি ও প্রোটিন এর চাহিদা;

তফসিল-৮(ক) এ মিল্ক রিপ্লেসার বা কাফ্ ষ্টার্টার এর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন পুষ্টির আদর্শ পরিমাণ;

তফসিল-৮(খ) বাড়ন্ত গরম অথবা ষাঁড় এর সম্পূর্ণ রেশন (টিএমআর) এর সর্বোচ্চ বা সর্বনিমণ পুষ্টির আদর্শ পরিমাণ;

তফসিল-৮(গ) দুধালো গাভী এর সম্পূর্ণ রেশন (টিএমআর) এর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন পুষ্টির আদর্শ পরিমাণ;

তফসিল-৯ এ নমূনা বিশ্লেষন অনুমোদিত পদ্ধতি;

তফসিল-১০ এ পশুখাদ্য বিনষ্টকরণ ও শোধন পদ্ধতি; বর্ণিত আছে।

৫.৯ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন

জনস্বাস্থ্য হলো সেই বিজ্ঞান যেখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, আইন এবং গবেষনা দ্বারা রোগ এবং আঘাত প্রতিরোধের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত এবং রক্ষা করার কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। অপরপক্ষে নিরাপদ প্রানিজ আমিষ বলতে বুঝায় সেই আমিষকে যা মানুষের খাবার উপযোগী, যা যেকোন প্রকার জীবানু মুক্ত , যেখানে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক কোন উপাদান নেই , যা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করে নির্দিষ্ট স্থানে, নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত করা হয়।

বর্তমানে জনগনের চাহিদা মোতাবেক জনস্বাস্থ্য ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন পরস্পরের পরি পূরক। কারণ নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ গ্রহন না করলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারন হতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে প্রাণিজ আমিষ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারন হয় ? প্রথম স্বাভাবিকভাবেই প্রাণিজ আমিষ যেমন : মাংস বিভিন্ন রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার জ ন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ, দ্বিতীয়ত, আমাদের আশে-পাশের নালা-নর্দমা, রাস্তা, বাজার ইত্যাদি জায়গায় এসব রোগজীবাণু ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে এন্থ্রাক্স, ব্রসিলোসিস, টিউবারকিউলোসিস, টেনিয়াসিস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। আর যখন রাস্তার আশে-পাশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গরু-ছাগল জবাই করা হয়, তখন এসব রোগজীবাণু মাংসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাংসের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবেশ করে। অনেক সময় এগুলো আমাদের দেহে রোগের সৃষ্টি করে। আর তাই আজ বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজ আমিষসহ অন্যান্য খাদ্য উৎপাদনের কলা-কৌশল শিখানোর মাধ্যমে অধিকতর নিরাপদ প্রানিজ আমিষ বা অন্যান্য খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য রক্ষা গুরুর্ত্বপূণ বিষয়। এ লক্ষ্য কে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিগত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দেশের না গরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন , ২০১৩ অনুমোদন করেছে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন , আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগীতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গত ২ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। অপরদিকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গত ২৩-২৭'শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রি: প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ পালন করে , যার প্রতিপাদ্য ছিল 'নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের প্রতিশ্রুতি সুস্থ সবল মেধাবী

জাতি'। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে প্রস্তাবি ত উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার অংশ হিসে বে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এদেশের জনগনের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে আরো গুরুত্বপূণ অবদান রাখবে।

৫.১০ প্রাণিসম্পদ বীমা (নীতিমালা)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে প্রস্তাবিত প্রাণিসম্পদ বীমা (নীতিমালা) এর বাস্তবায়ন এখন জরুরী বা সময়ের দাবী। কারন এদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠি পোল্ট্রি এবং গবাদিপশু পালনের সাথে জড়িত। এদেশের ভূমিহীন, ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক খামারীদের আয়ের উৎস, পুষ্টি সরবরাহ এবং কর্মসংস্থান তৈরীতে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের গুরত্ব অপরিসীম। দেশের বেশীর ভাগ প্রান্তিক খামারীরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য, বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে ১টি বা ২টি গুরু বা ছাগল পালন করে। আর এসকল প্রান্তিক খামারীদের গবাদিপশু নানা রকমের প্রাকৃতিক দূর্যোগ, চুরি, ডাকাতি, বিভিন্ন অজানা অসুখের কারনে অকাল মৃত্যু হলে তাদের নি:স্ব হয়ে পথে বসতে হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক/খামারী পশু-পালনে নিরুৎসাহিত হন। কিন্তু দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, বিশ্ববাজারে চামড়া শিল্পের বিকাশ, পরিবেশ বান্ধব কৃষি ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনায় এনে কোন রোগ বা অস্ত্রপচারের ফলে, প্রাকৃতিক এবং দূর্ঘটনা জনিত কারণে গবাদিপশুর মৃত্যু হলে, প্রান্তিক দরিদ্র কৃষক/খামারী এবং গবাদিপশুর খামার মালিকদের আর্থিক বিপর্যয়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং একইসাথে নতুন খামার স্থাপনে তাদের উদ্ধুদ্ধ করতে হবে। আর তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বীমা কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। প্রান্তিক খামারী এবং গবাদিপশুর খামার মালিকদের এ বীমা সুবিধা দিতে পারলে নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও বীমা থাকার কারনে তাঁরা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে। ফলে প্রান্তিক পর্যায়ে খামারী সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণসহ অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ সহজেই বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

আর তাই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রাণিসম্পদ বীমা-র উদ্দেশ্য হ'ল:

ক) কোন রোগ, প্রাকৃতিক এবং দূর্ঘটনা জনিত কারণে গবাদিপশুর মৃত্যু হলে, প্রান্তিক দরিদ্র কৃষক/খামারী এবং গবাদিপশুর খামার মালিকদের আর্থিক বিপর্যয় হতে রক্ষা করা।

খ) গবাদিপ্রাণির মানসম্মত উৎপাদন ক্ষমতা (যথা: মাংস, দুধ) বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিহীনতা হ্রাস।

গ) উন্নত চামড়া এবং চামড়াজাত পন্য উৎপাদন এবং তা রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।

ঘ) পশু চিকিৎসক দ্বারা সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থার শর্ত আরোপের মাধ্যমে গবাদিপশুর মৃত্যু হার হ্রাস্ব করা।

ঙ) সর্বোপরি গবাদিপশু উৎপাদন ও পালনের ক্ষেত্রে কৃষক ও খামারীদের অধিক বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

চ) দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস।

৬. প্রস্তাবিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার আলোকে সম্ভাব্য লক্ষ্যসমূহকে বিশ্লেষণ করা

৬. ১ পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ:

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাংলাদেশে বিকাশ ঘটতে শুরু করা পোল্ট্রি শিল্প ১৯৯০ এর দশকে এসে গতি প্রাপ্ত হয়। দেশে যে কয়েকটি শিল্পে র নীরব বিপ্লব ঘটেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পোল্ট্রি শিল্প। নানা ঘাত -প্রতিঘাত পেরিয়ে সরকারী সহযোগিতা এবং উদ্যোক্তাদের জ্ঞান, পরিশ্রম, বিনিয়োগে উচ্চ ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ শিল্প এখন একটি উদাহরণ। তৈরি হয়েছে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় এক শতাংশ আসে পোল্ট্রি শিল্প থেকে। গার্মেন্টসের পর এটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত। এ খাতে প্রায় ৬০ লাখ মানুষ জড়িত। সেই সাথে মেধাবী ভ বিষ্যত প্রজন্ম গড়তে পুষ্টির ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। শুধু তাই নয় , দেশ এখন মুরগির ডিম ও মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশে অসংখ্য বাণিজ্যিক লেয়ার খামার, ব্রয়লার খামার, ককরেল খামার, যথেষ্ট সংখ্যায় প্যারেন্টস্টক-গ্রান্ড প্যারেন্টস্টক খামার, হ্যাচারী, ফিড মিল ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। পোল্ট্রি শিল্পে মোমেন্টাম প্রাপ্তির অন্যতম রূপকার হলো এদেশের প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগ ও কর্মতৎপরতা। দেশের ন্যাশনাল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট পলিসি, পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি স্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিত দিয়েছে, দেশের পোল্ট্রি ও ডেইরী শিল্পের বিকাশে প্রাইভেট সেক্টরই হবে মূল চালিকা শক্তি এবং সরকার হবে সহায়ক শক্তি। আশির দশকে এ শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ হাজার ৫শ' কোটি টাকা। আর বর্তমানে এ শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন তথ্য -উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে , পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব হলে ২০২১ সালের মধ্যে বছরে ১২০০ কোটি ডিম ও ১০০ কোটি ব্রয়লার উৎপাদন সম্ভব হবে।

অপার সম্ভাবনাময় এই শিল্পের আরো বিকাশের লক্ষ্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বেসরকারী উদ্যোগত্তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকার ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় একদিন বয়সি বাচ্চার উৎপাদন ও বাজার চাহিদা সমন্বয়, বাচ্চার বাজার মূল্য নির্ধারণে উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণে মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে, শহর, উপশহর ও ঘন জনবসতি সমৃদ্ধ এলাকায় পোল্ট্রি হাব তৈরী, পোল্ট্রি বিপণনকে ওয়েট মার্কেট থেকে ধীরে ধীরে ড্রেস্ড মার্কেটে রূপান্তরের কথা চিন্তা করছে। ইতোমধ্যেই পোল্ট্রি ফিডের জন্য আমদানিকৃত অনেক উপাদানের উপর কর প্রত্যাহার কিংবা হ্রাস করা হয়েছে। কিন্তু তজ্জন্য পোল্ট্রি ফিডের খুচরা পর্যায়ে বাজার মূল্য হ্রাস পাওয়ার যে সুবিধা প্রান্তিক ও মাঝারী খামারীরা পাওয়ার কথা, সেটা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। বিষয়টি খামারী বান্ধব করার ক্ষেত্রে ফিড মিল মালিক ও বাজারজাতকারিদেরও ভূমিকা রাখতে হবে। খাদ্যের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ প্রয়োগ শুরু হয়েছে। পশুখাদ্যে হেভী মেটাল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ও বিধিতে সংযোজনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে। পশুখাদ্যের উৎপাদন করাখানার নিবন্ধন প্রদান অব্যাহত রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার আধুনিকীকরণ ও জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যাংক ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য সরকার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

৬.২ দুগ্ধ শিল্পের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ:

গাভীর দুধ মায়ের দুধের বিকল্প নয় কিন্তু গাভীর দুধের প্রায়োগিকতা জীবন ব্যাপী এবং জীবন ব্যাপী দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নিরাপদ দুধ ও দুগ্ধ পণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সেই ১৯৪৬ সালে তৎকালিন লাহিরীমোহনপুর এবং বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলায় গঠিত হয়েছিল National Nutrienty Company নামক প্রতিষ্ঠানটি ২০০০ লিটার ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি মিল্ক প্যান্ট স্থাপন করে । ১৯৫২ সালে 'ইস্টার্ন মিল্ক প্রোডাক্টস ' নামক একটি বেসরকারি কোম্পানি এটি কিনে নেয়। পরবর্তীকালে এটা কিছুটা সমবায় মডেলে রূপান্তরিত হয়। অত:পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে FAO, DANIDA, UNDP প্রভৃতি সংস্থার বহুমাত্রিক সহযোগিতায় ১৯৭৩ সালে Bangladesh Milk Producers Cooperative Union Ltd (BMPCUL) গঠিত হয় এবং ১৯৭৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত দুগ্ধ পণ্যগুলোর ব্র্যান্ড নাম দেওয়া মিল্কভিটা, যা বর্তমানেও এ নামেই দুধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৪৩টি চালু কারখানার মাধ্যমে দেশের ৩২টি জেলা ও ১৩২টি উপজেলায় সমবায়ী কৃষকদের নিকট থেকে বছরে ৬ কোটি লিটারের বেশি দুগ্ধ সংগ্রহ ও পরবর্তীত প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে (সূত্র:http://www.agriview২৪.com)। মিল্কভিটার পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রক্রিয়াজাত দুধ সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সাভারে সরকারি ডেইরী খামারটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৯৭৪ সাল থেকে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত শুরু করে। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মাত্র এই দুটি দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান দিয়ে দেশের চাহিদা পূরণ না হওয়ায় সেসময় স্কিমড মিল্ক ও বাটার ওয়েল আমদানী করে দেশে তরল দুধ তৈরী করা হতো। চাহিদার তুলনায় অপ্রতুলতার কারনে আমাদের দেশে এখনও প্রতিবছর প্রায় ১৪০০ কোটি টাকার গুড়ো দুধ বিদেশ থেকে আমদানী করা হয় (http://www.ittefaq.com.bd)। তবে এ কথা সত্য, ১৯৪৬ সালে যে দুগ্ধ শিল্পের শুরু, ১৯৯৬-৯৮ সালের দিকে আমু মিল্ক, টিউলিপ ডেইরী, ব্রাক ডেইরী বা আড়ং, বিক্রমপুর ডেইরী, আল্ট্রা শিলাইদহ ডেইরী, আফতাব ডেইরী, ২০০১ সালে প্রাণ ডেইরী এবং ২০০৭ সালে গ্রামিণ ডানোন, রংপুর ডেইরী, আকিজ গ্রুপ এবং সর্বশেষ এমেরিকান ডেইরী লিমিটেড দুগ্ধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাত ও বিপণন কার্যক্রম চালু করেছে। উল্লেখ্য যে, নিজেদের জন্য সেনাবাহিনীরও নিজস্ব দুধ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা রয়েছে। দেশে বর্তমানে ২০০টিরও বেশী দুগ্ধ শিতলীকরণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং স্বল্প পরিমাণে (মোট দুধ উৎপাদনের ৬-৮%) হলেও বাণিজ্যিকভাবে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ হচ্ছে।

৬.৩ চামড়া/চামড়া প্রক্রিয়াজাত শিল্প

চামড়া প্রাণিসম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজাত। চামড়া থেকে জুতা, সুটকেস, ব্যাগ, গরম পোশাক, গৃহাভ্যন্তরের সজ্জা সামগ্রী প্রভৃতি পণ্য তৈরি করা যায়।

চামড়ার চাহিদা ও যোগান: চামড়া একটি রপ্তানী পণ্য হওয়ায় এর চাহিদা অভ্যন্তরীণ বাজার ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বছর ৮৬ লক্ষ গরু-মহিষ ও ৮২ লক্ষ ছাগল-ভেড়ার চামড়া উৎপাদিত হয়। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে, বণিজ্যিকভাবে ১০৩০টি কুমিরের চামড়া রপ্তানী হয়েছে। অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটিয়েও বাংলাদেশ কাঁচা, প্রক্রিয়াজাত চামড়া, চামড়াজাত সামগ্রী রপ্তানী করে প্রতিবছর গড়ে ৩২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

চামড়ার উৎসঃ আমাদের দেশে চামড়ার প্রধান উৎস হচ্ছে গরু, মহিষ ও ছাগল। দেশে মোট চামড়া উৎপাদন গরু-মহিষ জবাইয়ের সংখ্যা, জবাইকৃত প্রাণির বয়স ও আকার, প্রাণিরোগ, জবাই পরবর্তী চামড়া ছাড়ানো ও প্রাথমিক সংরক্ষণের উপর উৎপাদন নির্ভর করে।

বাংলাদেশে চামড়া উৎপাদন ও মান উন্নয়নের সম্ভাবনাঃ বড় আকারের প্রাণির উৎপাদন ও প্রাণির সংখ্যা বৃদ্ধি করে চামড়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। বাংলাদেশে উন্নত জাতের গরু ও মহিষ পালন বৃদ্ধি, উত্তম স্বাস্থ্যবিধি ও পশুপালন চর্চা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চামড়ার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। তবে, উন্নত জাতের গরু ও মহিষ পালন বাড়ার সাথে সাথে দেশী জাতের গরু ও মহিষের পালন কমে আসবে। প্রাণির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হলেও সার্বিকভাবে গরু ও মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। তাই, সার্বিকভাবে এ উৎস হতে চামড়া উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে ছাগলের সংখ্যা বাড়িয়ে এ খাতের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। বাংলাদেশে প্রতিবছর উৎপাদিত চামড়ার একটি বড় অংশ চামড়ার ক্ষতি করে এমন রোগ , জবাই ও চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণে অদক্ষতার কারণে নষ্ট হয়। এ সকল রোগ দমন এবং চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণে অদক্ষতা কমিয়ে এনে চামড়া খাতে আয় বাড়ানো সম্ভব।

৬.৪ প্রক্রিয়াজাত প্রানিজ শিল্প ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানীমুখী প্রাণিজ পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -প্রক্রিয়াজাত তরল দুধ, মিষ্টি, দই, ঘোল, ইয়োগহার্ট, ঘি, মাখন, ছানা, পনির, প্যাকেটজাত মাংস, ওমেজাম, হাড়ের গুঁড়া, বোন চিপস, জিলাটিন, বুলস্টিক, গরুর লেজের লোম, কেসিং, মেয়োনিজ, চামড়াজাত পণ্য ইত্যাদি।

প্রক্রিয়াজাত প্রাণিজ পণ্যের চাহিদা ও রপ্তানী: বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত পশু পণ্যের যোগান মূলত অভ্যন্তরীণ উৎস নির্ভর হলেও কিছু কিছু পণ্য বিদেশ হতে আমদানী করা হয়। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানী উল্লেখযোগ্য নয় বিধায় এ সব পণ্যের চাহিদা মূলতঃ অভ্যন্তরীণ বাজার নির্ভর। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিগত ৩ বছরে কুয়েত, দুবাই, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউ এ ই এবং মালদ্বীপে ৫.০৯ লক্ষ কেজি মাংস ও মাংসজাত কারী, ইউএসএ -তে ১৭.৬৭ হাজার কেজি দধি ও রসমালাই, ৮৭৪৭ মে. টন বিফ বোন চিপস, ৫.৮৭ হজার কেজি বুলস্টিক, এবং ৪৭.৫৬ হাজার কেজি গরুর লেজের লোম রপ্তানী হয়েছে (সারণি-৩)। এছাড়া, নেপাল, মালদ্বীপসহ বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী দেশে ভেটেরিনারি ড্রাগস রপ্তানী শুরু হয়েছে।

সারণি-৩: বিগত ৩ বছরে প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানীর চিত্র:

১. মাংসঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	রপ্তানির তারিখ	দেশের নাম	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (কেজি)
১	বেঙ্গল মিট প্রসেসিং লিঃ	২৬/১২/২০১৩ ইং	দুবাই	বিফ মাংস	২৪,৯৯০
	বেঙ্গল মিট প্রসেসিং লিঃ	২৬/১২/২০১৩ ইং	কুয়েত	বিফ মাংস	২৪,৯৯৯
	বেঙ্গল মিট প্রসেসিং লিঃ	২৬/১২/২০১৩ ইং	কুয়েত	মাটন	৩,৯৯১
	বেঙ্গল মিট প্রসেসিং লিঃ	০৬/১১/২০১৬ ইং	মালদ্বীপ	বিফ মাংস	১,৬৩০
	বেঙ্গল মিট প্রসেসিং লিঃ	২০/১১/২০১৬ ইং	মালদ্বীপ	বিফ বারগার	১,৪৭৬
	বেঙ্গল মিট প্রসেসিং লিঃ	২৯/১১/২০১৬ ইং	মালদ্বীপ	বিফ বোন	১,৬২৫

	বেঙ্গল মিট প্রসেসিং লিঃ	১৯/১২/২০১৬ ইং	মালদ্বীপ	বিফ মাংস	১,৫৮৬
২	জনতা ফুডস	০৯/০৯/২০১৪ ইং	কোরিয়া	বিফ মাংস (কারি)	২,৮৮০
	জনতা ফুডস	১১/০১/২০১৫ ইং	কোরিয়া	বিফ মাংস (কারি)	২,৮৩২
৩	মেজিষ্টিক এন্টারপ্রাইজ	২৩/০৯/২০১৪ ইং	মালদ্বীপ	বিফ মাংস	১০,০০০
	মেজিষ্টিক এন্টারপ্রাইজ	০৯/০৬/২০১৫ ইং	মালদ্বীপ	বিফ মাংস	১২,০০০
	মেজিষ্টিক এন্টারপ্রাইজ	০৯/০৬/২০১৫ ইং	মালদ্বীপ	মাটন	৩,০০০
	মেজিষ্টিক এন্টারপ্রাইজ	০৯/০৬/২০১৫ ইং	মালদ্বীপ	চিকেন	৩,০০০
	মেজিষ্টিক এন্টারপ্রাইজ	০৯/০৬/২০১৫ ইং	মালদ্বীপ	ডাক	২,০০০
	মেজিষ্টিক এন্টারপ্রাইজ	০৯/০৬/২০১৫ ইং	মালদ্বীপ	বিফ মাংস	১৬,০০০
	মেজিষ্টিক এন্টারপ্রাইজ	২১/০৯/২০১৫ ইং	মালদ্বীপ	বিফ মাংস	১৬,০০০
				মোট =	**৪,৭৭,৪৩৩.৬০**

২. দধিঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	তারিখ	দেশের নাম	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (কেজি)
১.	পুতুল ইমপোর্ট এক্সপোর্ট	২৭/০১/২০১৪ ইং	আমেরিকা	দধি	২,৪০০
		২১/০৫/২০১৪ ইং			৪,০০০
২.	ইজি কুক ফুড প্রসেসিং লিঃ	৩১/১২/২০১৫ ইং		দধি ও রসমালাই	৮৫০
		৩১/০৩/২০১৬ ইং			৮০০
		২৮/০৪/২০১৬ ইং			৩,০৪০
		১৭/০৭/২০১৬ ইং			৪০০
		২০/১১/২০১৬ ইং			৪,৪৬৪
		১৪/০১/২০১৭ ইং			১,৭১৬
				মোট =	**১৭,৬৭০**

৩. বিফ বোন চিপসঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	রপ্তানির তারিখ	দেশের নাম	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (মেঃ টন)
১	এগ্রো রিসার্স কোং লিঃ সৈয়দপুর, নীলফামারী	০৫/০৯/২০১৩ ইং	চীন	বিফ বোন চিপস	১০০
		০৭/০৪/২০১৪ ইং			২৮০
		০৪/০৫/২০১৪ ইং			৬০০
		২৮/০৭/২০১৪ ইং			৬০০
		২১/০৭/২০১৪ ইং			৫০০
		০৯/০৯/২০১৪ ইং			৬০০
		১৭/১১/২০১৪ ইং			৬০০
		০৯/১২/২০১৪ ইং			১০৫
		১২/০২/২০১৫ ইং			৮০০
		২৯/০৯/২০১৫ ইং			৫০০
		১৪/১১/২০১৬ ইং			৬৩০
		১১/০৩/২০১৭ ইং			৫২০
২.	মেসার্স এইচ এন্ড বি ট্রেডিং, চট্টগ্রাম	১০/০৬/২০১৫ ইং	চীন	বিফ বোন চিপস	৫৬০
		১৬/০২/২০১৬ ইং			২০
		১৬/০২/২০১৬ ইং			১৯৬
		২২/০৩/২০১৬ ইং			১৯৬
		১৭/০২/২০১৭ ইং			৬৩৪
				মোট =	**৮,৭৪৭**

৪. বুলষ্টিকঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	রপ্তানির তারিখ	দেশের নাম	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (কেজি)
১	মেসার্স এইচ আর এন্টারপ্রাইজ	৩০/১২/২০১৪ ইং	আমেরিকা	বুলষ্টিক	২,৫১৯
২	এস এন্ড এস ইন্টারন্যাশনাল	১৫/০২/২০১৫ ইং			২৭০
		১৮/০৩/২০১৫ ইং			৭৬.২৮
		১৭/০৫/২০১৫ ইং			২৩২.১০
		১৭/১২/২০১৬ ইং			৪১০
		০৫/০২/২০১৭ ইং			৪০৯
৩	ক্যামেলিয়া ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	২৬/০৭/২০১৫ ইং	আমেরিকা		৩০০
৪	আর্থ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	০৮/১১/২০১৬ ইং			২৪৫
				মোট =	**৫,৮৭০.২৫**

৫. গরুর লেজের লোমঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	রপ্তানির তারিখ	দেশের নাম	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (কেজি)
১	সাইনোবাংলা, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম	২৮/০১/২০১৫ ইং	চীন	গরুর লেজের লোম	২,৫০০ কেজি
		১৬/০৪/২০১৫ ইং			২,৫০০ কেজি
		১৩/০৭/২০১৫ ইং			২,৫০০ কেজি
		১৫/১২/২০১৫ ইং			৭,৫০০ কেজি
		০৭/১২/২০১৫ ইং			১,৯০০ কেজি
		১৪/০৮/২০১৬ ইং			৪,০০০ কেজি
		১৭/১১/২০১৬ ইং			৪,৪০০ কেজি
২	করোনা ট্রেডিং কোং	৩০/০৯/২০১৪ ইং	থাইল্যান্ড	গরুর লেজের লোম	৩,০০০ কেজি
		১৪/০৯/২০১৪ ইং			২,৫০০ কেজি
		৩০/০৩/২০১৫ ইং			২,৫০০ কেজি
৩	বেন এন্ড জেন ইন্টারন্যাশনাল, তুরাগ, ঢাকা।	২০/১২/২০১৬ ইং	চীন	গরুর লেজের লোম	৮,৩৬৮ কেজি
		০৫/০২/২০১৭ ইং			৫৮৯২ কেজি
				মোট=	**৪৭,৫৬০ কেজি**

প্রক্রিয়াজাত প্রাণিজ পণ্যের উৎসঃ বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাত প্রাণিজ পণ্যের মূল উৎস অসংগঠিত গ্রামীণ খাত। ইদানীং এ খাতে বিনিয়োগে সংগঠিত ব্যক্তিখাত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। দেশে মিট প্রসেসিং ইন্ডাস্টিজ ও প্রাণিজ উপজাত প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ ঘটছে।

বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাত প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানী সম্ভাবনাঃ প্রক্রিয়াজাত প্রাণিজ পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কাউন্সিলরগণ বিভিন্ন দেশে হালাল মাংস রপ্তানির জন্য নতুন বাজার অন্বেষণে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এদেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া, মালদ্বীপ ও কুয়েতে হালাল মাংস ও মাংসজাত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশেও মাংস ও মাংসজাত পণ্য (বোন চিপস, গরুর লেজের লোম, বুল স্টিক ইত্যাদি) রপ্তানীর অপার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, মাংস রপ্তানি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য রোগ নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে এফএমডি (ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ), এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও এ্যানথ্রাক্স রোগ নিয়ন্ত্রণ , ট্রেসিবিলিটি, জোনিং, উত্তম স্বাস্থ্যবিধি ও পশুপালন চর্চা এবং হালাল সার্টিফিকেশন দরকার। তাছাড়া, প্রাণিজ পণ্য উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি সহজতর করার জন্য বিনিয়োগ আকর্ষণের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশের প্রাণিজ উপজাত রপ্তানী শিল্প মূলত: কাঁচামাল রপ্তানী নির্ভর। এসকল উপজাত দেশে সহজলভ্য হওয়ায়, শুধুমাত্র সঠিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও অভ্যন্তরীণভাবে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন ও রপ্তানীর অধিক সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পোষা প্রাণী যেমন- কুকুর, বিড়াল, হরিণ ইত্যাদি এবং ল্যাবরেটরি জন্তুর ব্যাপক চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের মাধ্যমে রপ্তানী শিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভব। বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, কুমির ও গুঁইসাপ, জরুরী ঔষধ, মাংস ও চামড়া উৎপাদনে বহুল ব্যবহৃত এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাদৃত। এসব প্রাণির বাণিজ্যিক খামার স্থাপন সম্প্রসারণ ও রপ্তানীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এজন্য-

- প্রাণিজ পণ্যের চাহিদা ও যোগানের সঠিক উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- বিদ্যমান কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অঞ্চলভিত্তিক নতুন কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপন;
- এফএমডি ডিজিজ), এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও এ্যানথ্রাক্স রোগ নিয়ন্ত্রণ;
- প্রাণিজ উপজাতসমূহ সাংগঠনিক উপায়ে সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ;
- নিরাপদ খাদ্যবিধি মেনে চলা;
- Good Manufacturing Practice এবং Good Management Practice;
- রপ্তানীমূখী প্রাণিজাত শিল্প ও ভেটেরিনারি ঔষধ শিল্প সম্প্রসারণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি;
- পণ্য উৎপাদন, মোড়কজাতকরণ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিপননে স্বাস্থ্যবিধি পালন;
- ব্যয়সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী Low Fat meat, Specific vitamin and mineral enrich animal product, meat for diabetic and cardiac patient ইত্যাদি ডাইভার্সিফাইড/ফর্টিফাইড প্রাণিজ পণ্য উৎপাদন;
- আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা চিহ্নিত করা ও অপসারণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও সার্টিফিকেশনের সামর্থ্য সৃষ্টি;
- অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি অন্তর্জাতিকভাবে প্রাণিজ পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

৭. প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকল্পে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারন করা হয়েছে

এ মহাপরিকল্পনায় প্রাণিসম্পদের সংখ্যাগত উৎপাদন, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন, প্রাণিরোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নজরদারি, প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন ও মূল্য সংযোজন, রপ্তানীমুখী শিল্পের সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকরণ, প্রাণিসম্পদ ডাটাবেজের উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, আইনী কাঠামোর সংস্কার, উৎপাদনকারীর আর্থিক নিরাপত্তা ও চামড়া উৎপাদন এর আলাদা খাত বিবেচনায় প্রক্ষেপন উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের উৎপাদন মাত্রাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে।

৭.১ দুধ, মাংস ও ডিমের প্রক্ষেপিত চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রা

দুধ, মাংস ও ডিমের পুষ্টিগত চাহিদা, জনসংখ্যার প্রাক্কলন ও প্রাণিজাত পণ্যের রপ্তানী বিবেচনায় পর্যায়ভিত্তিক চাহিদা ও উৎপাদনের সারণি-৪ এবং লেখচিত্র ৫ হতে ৭ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৪: দুধ, মাংস ও ডিমের পর্যায়ভিত্তিক (০৫ বছর পর পর) প্রক্ষেপিত চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	সন	প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা [ক] (মিলিয়ন)	দুধ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)		মাংস (মিলিয়ন মেট্রিক টন)		ডিম (মিলিয়ন টি)	
			প্রক্ষেপিত চাহিদা [খ]	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রক্ষেপিত চাহিদা [খ]	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রক্ষেপিত চাহিদা [খ]	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	২০১৫-১৬	১৬১.০	১৪.৬৯	৭.২৭[গ]	৭.০৫	৬.১৫[গ]	১৬৭৪৪.০০	১১৯১২.৪০[গ]
২.	২০২১	১৭৩.৬	১৫.৮৪	৯.৪৬	৭.৬০	৬.৯৬	১৮০৫৪.৪০	১৭৮১৫.০০
৩.	২০২৬	১৮৬.৬	১৭.০৩	১১.৭৫	৮.১৭	৭.৯৯	১৯৪০৬.৪০	১৯৭৯৭.৬৭
৪.	২০৩১	১৯৯.৬	১৮.২১	১৪.০৩	৮.৭৪	৯.০২	২০৭৫৮.৪০	২১৭৮০.৩৩
৫.	২০৩৬	২১২.০	১৯.৩৫	১৬.৩২	৯.২৯	১০.০৪	২২০৪৮.০০	২৩৭৬৩.০০
৬.	২০৪১	২২৩.৫	২০.৩৯	১৮.৬০	৯.৭৯	১১.০৭	২৩২৪৪.০০	২৫৭৪৫.৬৭
৭.	২০৪৬	২৩৪.৫	২১.৪০	২০.৮৯	১০.২৭	১২.১০	২৪৩৮৮.০০	২৭৭২৮.৩৩
৮.	২০৫১	২৪৫.৬	২২.৪১	২৩.১৮	১০.৭৬	১৩.১৩	২৫৫৪২.৪০	২৯৭১১.০০
৯.	২০৫৬	২৫৬.০	২৩.৩৬	২৫.৪৬	১১.২১	১৪.১৬	২৬৬২৪.০০	৩১৬৯৩.৬৭
১০.	২০৬১	২৬৫.২	২৪.২০	২৭.৭৫	১১.৬২	১৫.১৯	২৭৫৮০.৮০	৩৩৬৭৬.৩৩
১১.	২০৬৬	২৭৪.৩০	২৫.০৩	৩০.০৪	১২.০১	১৬.২১	২৮৫২৭.২০	৩৫৬৫৯.০০

[ক] সূত্র: পপুলেশন প্রজেকশন অব বাংলাদেশ, বিবিএস।
[খ] দুধ ২৫০ মিলি/দিন/জন, মাংস ১২০ গ্রাম/দিন/জন, ডিম ১০৪ টি/বছর/জন হিসেবে।
[গ] ভিত্তি বছরে উৎপাদন।

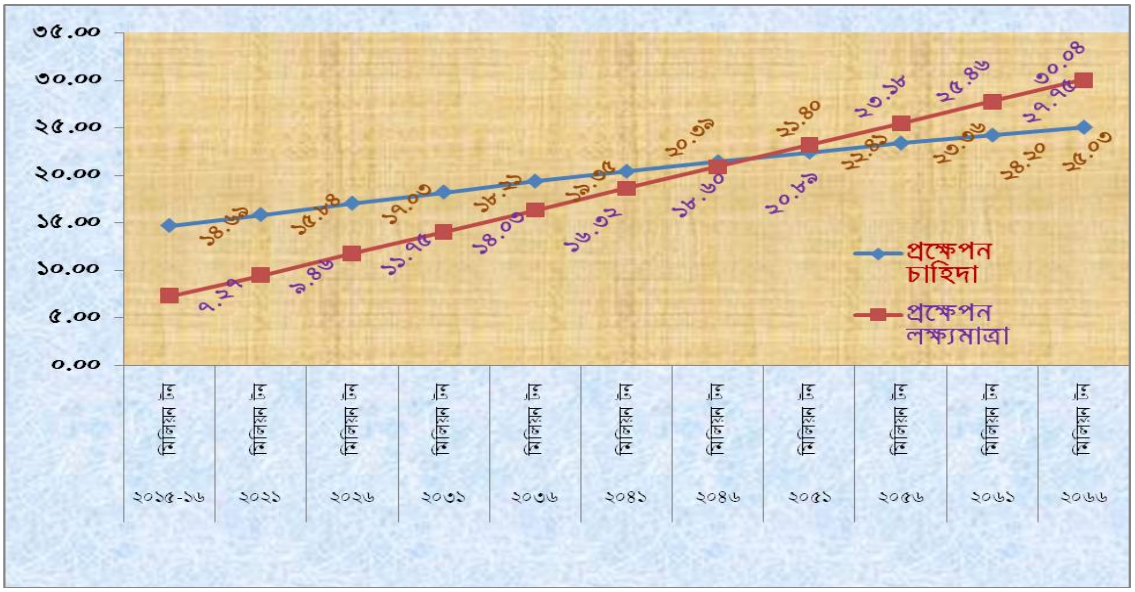

লেখচিত্র-৫: দুধ উৎপাদনের প্রক্ষেপিত চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রা

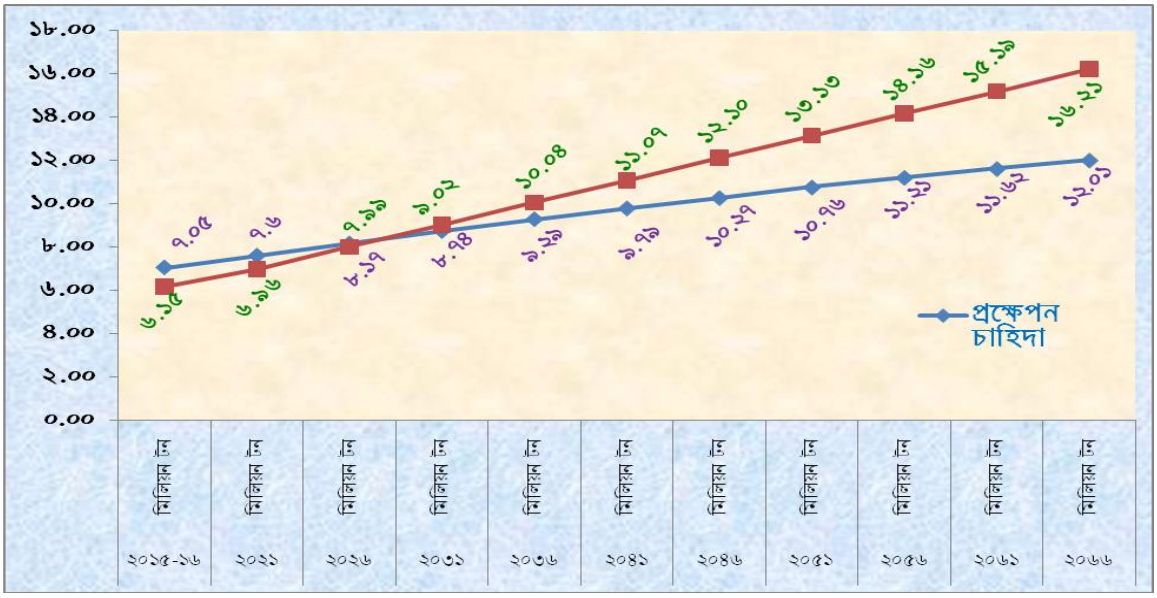

লেখচিত্র-৬: মাংস উৎপাদনের প্রক্ষেপিত চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রা

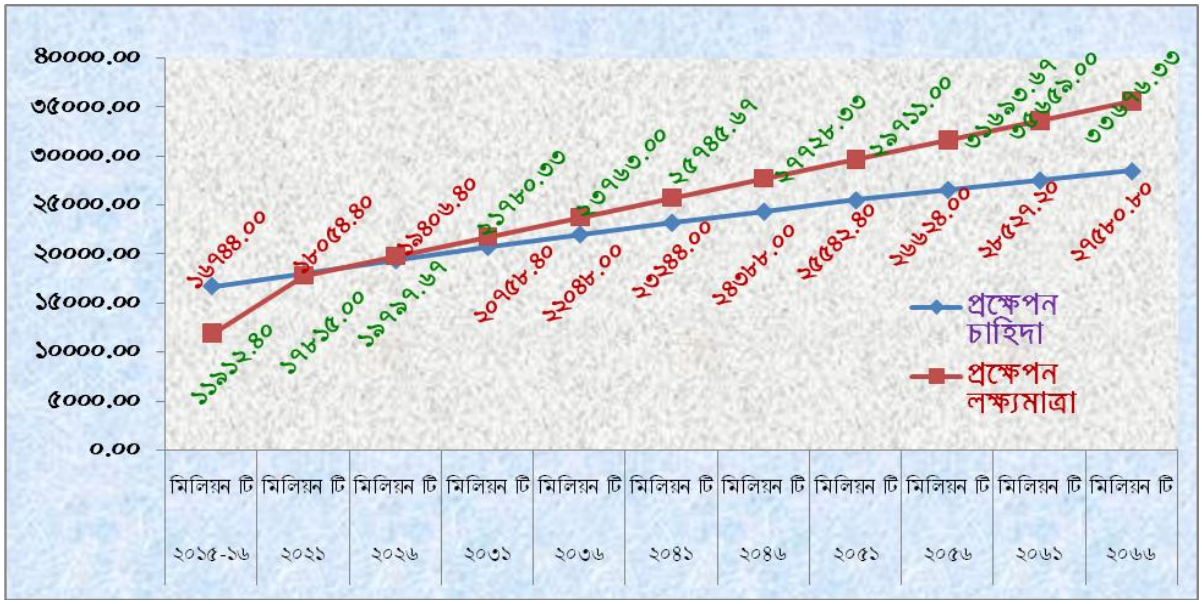

লেখচিত্র-৭: ডিম উৎপাদনের প্রক্ষেপিত চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রা

৭.২ প্রাণিসম্পদের উৎপাদন

গরু ও ছাগলের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশী ঘনত্ব বিশিষ্ট দেশ। এমতাবস্থায়, দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশের সীমিত ইনপুটস তথা জমি, পশুখাদ্য ইত্যাদি বিবেচনায় প্রাণিসম্পদের সংখ্যাগত উৎপাদন বৃদ্ধি নয় বরঞ্চ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকেই নজর দিতে হবে। তবে, উপকূলীয় অঞ্চল, হাওড় এলাকা ও নতুন জেগে উঠা চরাঞ্চল সমূহে মহিষের সংখ্যাগত উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। হাঁস ও মুরগি আধুনিক পদ্ধতিতে (ইনটেনসিভ) বাণিজ্যিক খামার বৃদ্ধির মাধ্যমে সংখ্যাগত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, রপ্তানী চাহিদা বিবেচনায় টার্কি, কোয়েল, তিতির, উটপাখি, কবুতর, খরগোশ ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রাণিসম্পদের প্রাপত্য/উৎপাদনের ভিত্তিতে zoning করে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজন। আর তাই প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল পত্রের আলোকে দুধ/মাংশ বা ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে GIS (Geographic Information System)-এর মাধ্যমে দেশের অধিক দুধ/মাংশ ও ডিম উৎপাদনশীল এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করে ডেইরি হাব/মাংশ বা দুধের বিশেষায়িত অঞ্চল সৃষ্টিকরণের উদোগ্য গ্রহন করা হয়েছে।

নিম্নের সারণী-৫ এবং লেখচিত্র-৮ হতে ১০-এ সংখ্যাগত বৃদ্ধি/হ্রাসের প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা প্রদর্শিত হলোঃ

সারণী-৫: গবাদিপশু ও পাখি উৎপাদনের প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	প্রজাতি	সংখ্যা লক্ষ (২০১৫-১৬)	প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা ('০০০০০)		
			স্বল্পমেয়াদী (২০১৭-২০৩১)	মধ্যমেয়াদী (২০৩২-২০৪৬)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪৭-২০৬৬)
১.	গরু	২৩৭.৮৫	২৩৩.০৯	২২৬.১০	২১৪.৮০
২.	মহিষ	১৪.৭১	১৬.১৮	২০.২৩	২৭.৩১

৩.	ছাগল	২৫৭.৬৬	২৬২.৮১	২৭০.৭০	২৮৪.২৩
৪.	ভেড়া	৩৩.৩৫	৩৫.০২	৩৬.৭৭	৪০.৪৫
৫.	মুরগি	২৬৮৩.৯৩	৩৭৫৭.৫০	৫৬৩৬.২৫	৮৪৫৪.৩৮
৬.	হাঁস	৫২২.৪০	৬২৬.৮৮	৮১৪.৯৪	১০৫৯.৪৩
৭.	কবুতর	৯০.০২	১০৮.০২	১২৯.৬৩	১৫৫.৫৫
৮.	কোয়েল	২৫.১০	৫০.২০	১০০.৪০	২০০.৮০
৯.	খরগোশ	২.০১	৪.০২	৮.০৪	১৬.০৮
১০.	রাজহাঁস	২.০৩	৪.০৬	৮.১২	১৬.২৪
১১.	টার্কি	০.৩০	১.৮০	১০.৮০	৬৪.৮০
১২.	তিতির	১.০৪	২.০৮	৪.১৬	৮.৩২
১৩.	শূকর	৪.১০	৪.৯২	৬.৪০	৮.৩১

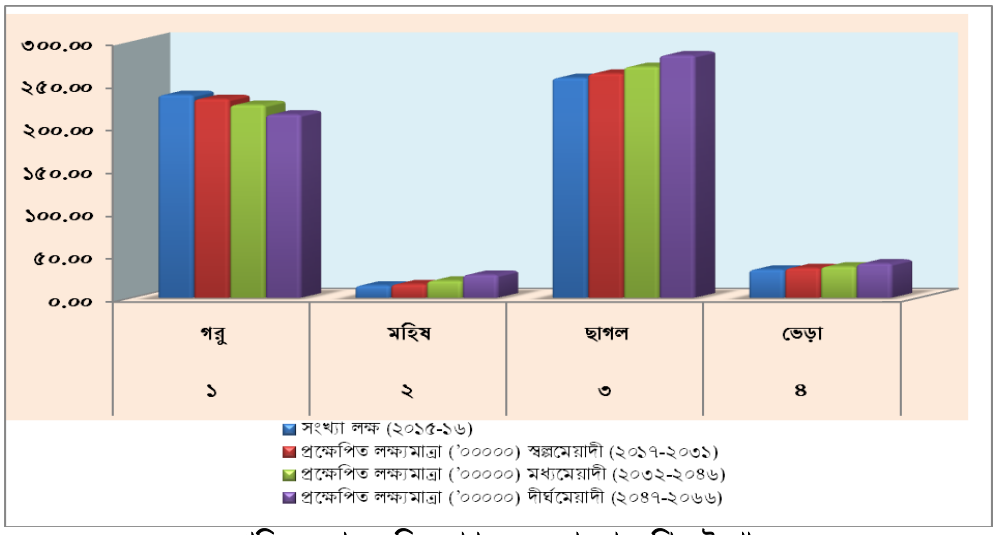

লেখচিত্র-৮: গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার প্রক্ষেপিত উৎপাদন

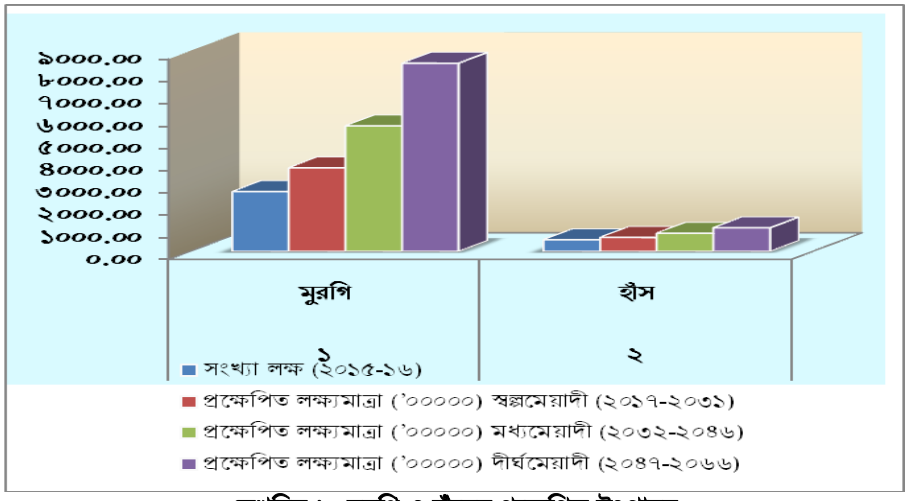

লেখচিত্র-৯: মুরগি ও হাঁসের প্রক্ষেপিত উৎপাদন

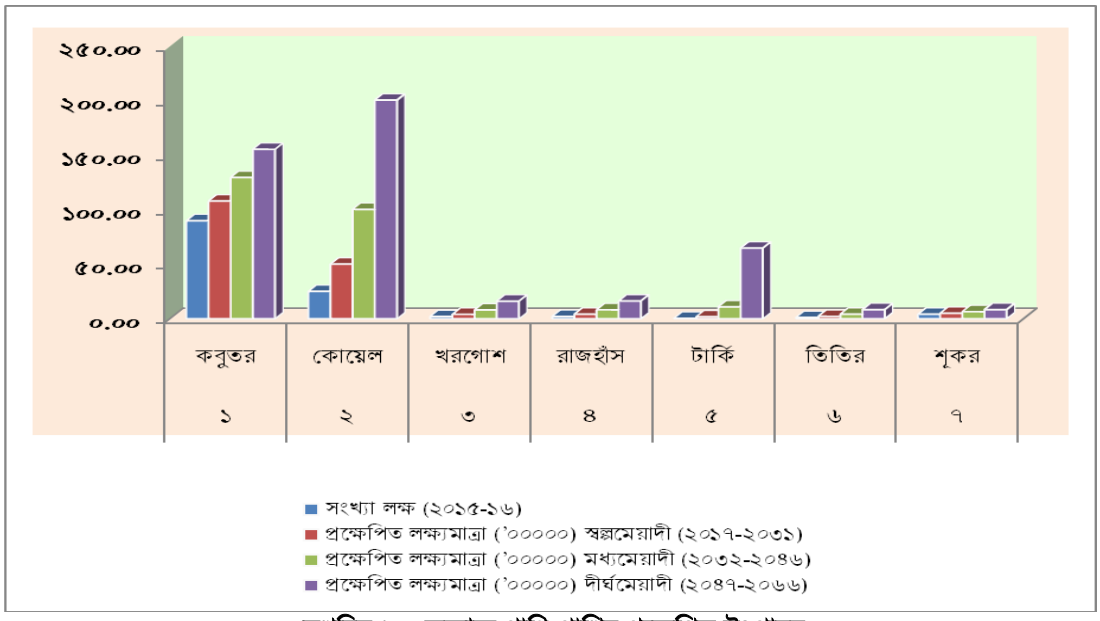

লেখচিত্র-১০: অন্যান্য প্রাণি-পাখির প্রক্ষেপিত উৎপাদন

৭.৩ দুধ উৎপাদন

দুধ একটি আদর্শ খাদ্য, এর পুষ্টি উপাদান গুলি হলো আমিষ, চর্বি, শর্করা, পানি , খনিজ ও ভিটামিন। দুধ দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, শক্তির যোগান, বিপাকীয় কার্যাবলী সম্পাদন, নার্ভ রিলাক্সেশন এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

দুধের চাহিদা ও যোগান: বয়স, খাদ্যাভ্যাস, পেশা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও রপ্তানী চাহিদার উপর দুধের চাহিদা নির্ভর করে। এফ.এ.ও এর হিসাব অনুযায়ী একজন পূর্ন বয়স্ক মানুষের খাদ্য তালিকায় ২৫০ মিলি দুধ থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারাদেশে দুধ উৎপাদন ৭.২৭ মিলিয়ন মে.টন । সে অনুযায়ী দেশে মাথাপিছু দৈনিক দুধের প্রাপ্যতা ১২৫.৫৯ মিলি।

দুধের উৎস: আমাদের দেশে দুধের প্রধান উৎস হচ্ছে গরু ও মহিষ। দেশে দুধের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতি বছর বিদেশ হতে গড়ে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকার গুড়ো দুধ আমদানী করা হয়।

দুধের ব্যাপক চাহিদা থাকায় দেশে ডেইরি শিল্প জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং গ্রাম, শহর ও শহরতলীতে অধিক উৎপাদনশীল গরু পালনের প্রবণতা বাড়ছে। এ ছাড়া এখনও গ্রামাঞ্চলে কিছু গাভি হাল টানা ও দুগ্ধ উৎপাদন এই দ্বৈত উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ সারাদেশে দুগ্ধ ও পরিবহনের দ্বৈত উদ্দেশ্যে মহিষ পালন করা হয়ে থাকে। মূলতঃ মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পালন করা হলেও ছাগল হতে স্বল্প পরিমান দুধ পাওয়া যায়।

সারণী-৬: উৎস অনুযায়ী দুধ উৎপাদন (২০১৫-১৬)

দুধ উৎপাদন		গবাদি পশুর সংখ্যা (লক্ষ)	উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	একক প্রাপ্ত উৎপাদন
১.	সংকর জাতের দুগ্ধবতী গাভী	২২.৬০	৫৭.৭৩	৭.০০ লিটার/প্রতিদিন/গাভী
২.	দেশীয় দুগ্ধবতী গাভী	৩৬.৮৭	৯.৮৮	২৬৮ লিটার/ল্যাকটেশন
৩.	দুগ্ধবতী মহিষ	৩.৬৮	৪.৭০	৩.৫০ লিটার/প্রতিদিন/মহিষ
৪.	দুগ্ধবতী ছাগী	৪৫.০৯	০.৪৫	১০.০০ লিটার/ল্যাকটেশন
		সর্বমোট =	৭২.৭৫	

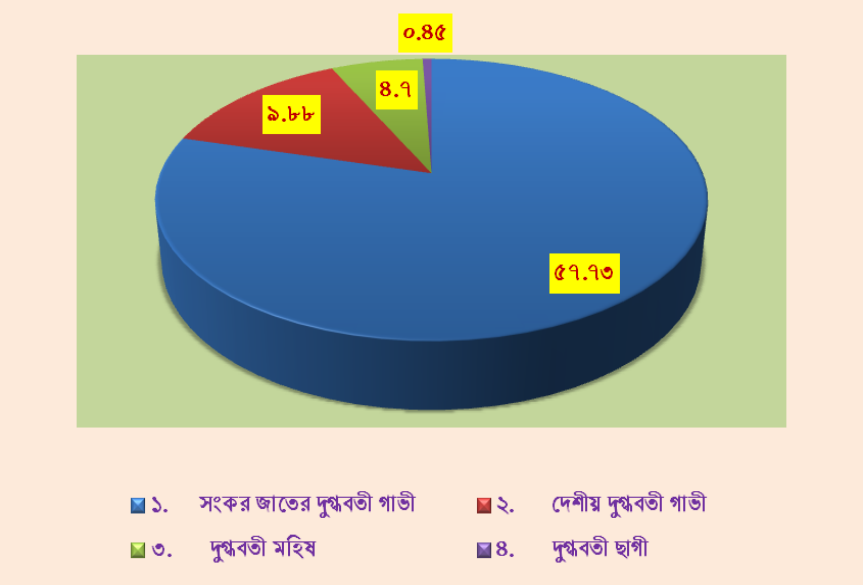

লেখচিত্র-১১: দুধ উৎপাদনের উৎসভিত্তিক চিত্র

বিগত বছরগুলোতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের ফলে দেশের প্রায় ৩৮ ভাগ গরু সংকর জাতে রূপান্তরিত হয়েছে। যার মধ্যে ২২.৬০ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী। বর্তমানে সংকর জাতের দুগ্ধবতী গাভী হতে বছরে ৫৭.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হচ্ছে। এ ছাড়া দ্বৈত উদ্দেশ্যে পালিত দেশীয় জাতের গাভী থেকে ৩৬.৮৭ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী হতে বছরে ৯.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে ৩.৬৮ লক্ষ দুগ্ধবতী মহিষ হতে বছরে ৪.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হচ্ছে এবং ৪৫.০৯ লক্ষ দুগ্ধবতী ছাগী হতে বছরে ০.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে দুধ উৎপাদনের সম্ভাবনাঃ দেশে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি নয় বরঞ্চ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকেই নজর দিতে হবে। লক্ষ্যণীয় যে সংকর জাতের দুগ্ধবতী গাভী হতে বছরে দৈনিক গড়ে প্রায় ৭.০০ লিটার দুধ উৎপাদিত হলেও দ্বৈত উদ্দেশ্যে পালিত ৩৬.৮৭ লক্ষ দেশী দুগ্ধবতী গাভী হতে বছরে মাত্র ৯.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হচ্ছে । কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় অধিক সংখ্যক দেশী জাতের গাভী আনয়নের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন করে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব । শুধুমাত্র বিদ্যমান দ্বৈত উদ্দেশ্যে পালিত গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় আনা গেলে কমপক্ষে ২০৩১ সাল নাগাদ ৭৫ ভাগ এবং ২০৪৬ সাল নাগাদ ১০০ ভাগ গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ঘটবে এবং এতে সংকর জাতের দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ২২.৬০ লক্ষ হতে ৫৬.২১ লক্ষতে বৃদ্ধি পাবে । ফলশ্রুতিতে ২০৩১ সালে মধ্যে সংকর জাতের দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন দাঁড়াবে বছরে ১৬১.৩০ লক্ষ লিটার । আবার সংকর জাতের দুগ্ধবতী গাভীর উৎপাদন দেশী জাতের গাভীর চেয়ে বেশী হলেও তা আন্তর্জাতিক গড়মানের তুলনায় অনেক কম। এই উৎপাদনশীলতা ২০৩১ সালে ১০ লিটারে এবং ২০৪৬ সালে ১৫ লিটারে এবং ২০৬৬ সালে ২০ লিটারে উন্নীত করতে পারলে দুধের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে । বর্তমানে ৩.৬৮ লক্ষ দুগ্ধবতী মহিষ হতে দেশে বছরে ৪.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হচ্ছে । অথচ ভারত ও পাকিস্তানে বার্ষিক মোট দুধ উৎপাদনের প্রায় ৬০ ভাগ দুধ আসে মহিষ হতে । বর্তমানে দেশে মহিষের গড় দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩.৫০ লিটার । জাত উন্নয়ন, খাদ্য ও পালন ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে গড় দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩.৫০ লিটার হতে পর্যায়ক্রমে ১৫ লিটার বৃদ্ধি করা সম্ভব । এ ছাড়া দেশে নীলি, রাভি, মুররাহ প্রভৃতি উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের মহিষ পালন করা হলে মহিষের গড় দুধ উৎপাদন আরও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে ।

৭.৪ মাংস উৎপাদন

মাংস প্রাণিজ আমিষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মাংসের আমিষ যেমন আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে সহায়ক তেমনি এর চর্বি, পানি, খনিজ পদার্থ আমাদের শক্তির জোগান, বিপাকীয় কার্যাবলী সম্পাদন এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। শিশু ও বর্ধিষ্ণু কিশোর-কিশোরীর খাদ্য তালিকায় মাংস একটি অপরিহার্য অংশ। মাংস ছাড়াও প্রা ণির শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গ যেমন যকৃত, নরম অস্থি, ফুসফুস এমনকি অন্ত্রও উপাদেয় খাদ্য হিসেবে বিবেচিত।

মাংসের চাহিদা ও যোগান: বয়স খাদ্যাভাস, পেশা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং রপ্তানী চাহিদার উপর মাংসের চাহিদা নির্ভর করে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতাও মাংসের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। FAO এর হিসাব অনুযায়ী একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের খাদ্য তালিকায় ১২০ গ্রাম মাংস থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে মাংস উৎপাদন ৬.১৫ মিলিয়ন মে.টন। সে অনুযায়ী দেশে মাথাপিছু মাংসের প্রাপ্তি গড়ে ১০৬.২১ গ্রাম।

মাংসের উৎসঃ আমাদের দেশে মাংসের প্রধান উৎস হচ্ছে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, হাঁস, কবুতর ও অন্যান্য পাখি। বাংলাদেশে গরুপালন সাধারণত দ্বৈত উদ্দেশ্যে করা হলেও সাম্প্রতিক সময়, মাংসের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সারা দেশে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ কর্মসূচী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কোরবানীর ঈদ উপলক্ষে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ষাঁড় হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে অনেক খামার গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি টার্কি, তিতির, কোয়েল, রাজহাঁস প্রভৃতি পাখি পালনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তা'ছাড়া, দুগ্ধবতী গাভী উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত বাছুর উৎপাদিত হয় তার প্রায় ৫ ০% এঁড়ে বাছুর। এ সমস্ত এঁড়ে বাছুর মাংস উৎপাদনের কাজে লাগে। বর্তমানে উৎপাদিত ষাঁড়ের প্রায় ৪২ শতাংশ সংকর জাতের হওয়ায় ৭০% ড্রেসিং পার্সেন্টেজ হিসেবে প্রতিটি ষাঁড় থেকে গড়ে ২১০ কেজি মাংস ও ওফালস (Offals) পাওয়া যায়। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল সহ চরাঞ্চলে অধিক হারে মহিষ পালন করা হয়। তবে সারা দেশেই কিছু কিছু মহিষ পালন করা হয়। বাংলাদেশে মহিষ পালন মূলতঃ পরিবহন ও দুগ্ধ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে করা হলেও এসব মহিষ মাংস উৎপাদনের জন্য জবাই করা হয়। দেশে বর্তমানে non-descriptive জাতের মহিষ পাওয়া যায়। প্রতিটি মহিষ হতে গড়ে ২৫০ কেজি মাংস ও ওফালস (Offals) পাওয়া যায় । সে অনুযায়ী বছরে মহিষের মাংস উৎপাদিত হয় ২.৯৯ লক্ষ মে.টন। বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের মাংস অত্যন্ত উপাদেয়। দেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল ছাড়াও যমুনাপারী জাতের ছাগল পাওয়া যায়। দেশে উৎপাদিত ছাগল থেকে গড়ে ১১ কেজি মাংস পাওয়া যায় এবং সে অনুযায়ী বছরে ছাগলের মাংস উৎপাদিত হয় ৩.২৩ লক্ষ মে.টন। প্রতিটি ভেড়ার হতে গড়ে ১০ কেজি মাংস পাওয়া যায় এবং সে অনুযায়ী বছরে ভেড়া মাংস উৎপাদিত হয় ৩৮ হাজার মে.টন। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে দেশের প্রধান জনগোষ্ঠী শুকরের মাংস গ্রহণ করে না। তবে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নিকট শুকরের মাংস জনপ্রিয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম, মধুপুরের গড়, গাজীপুরের কিছু অঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল বসতি অঞ্চলে শুকর পালন করতে দেখা যায়। তবে, অধিকাংশ শুকরই দেশী জাতের এবং এদের উৎপাদনশীলতা নিম্নমানের । দেশে প্রায় ৪ লক্ষ শূকর আছে। বাংলাদেশের গ্রামীন ও বানিজ্যিক পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা হয়। গ্রামীণ পদ্ধতিতে পালিত মুরগি ডিম ও মাংস উৎপাদনের দ্বৈত উদ্দেশ্য পালন করা হয়। বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে মাংস উৎপাদনশীল জাত (ব্রয়লার জাত এবং সোনালী) এর মুরগি পালন করা হয়। এছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পালিত লেয়ার মুরগির ডিম পারার হার যখন লাভজনক মাত্রায় থাকে না তখন তা মাংস উৎপাদনের নিমিত্তে ব্যবহার করা হয়। দেশে বর্তমানে প্রায় ৩৫ ভাগ দেশীয়, ৫০ ভাগ ব্রয়লার ও ১৫ ভাগ লেয়ার মুরগির খামার রয়েছে। প্রতিটি ব্যাকইয়ার্ড মুরগি থেকে গড়ে ১.৫ কেজি, ব্রয়লার মুরগি থেকে ২.০ কেজি এবং লেয়ার মুরগি থেকে ২.৫ কেজি মাংস উৎপাদিত হয় এবং সে অনুযায়ী ভেড়া বছরে মুরগির মাংস উৎপাদিত হয় ৩৬.৮৭ লক্ষ মে.টন। প্রতিটি হাঁস হতে গড়ে ১.৮ কেজি মাংস পাওয়া যায় এবং সে অনুযায়ী বছরে হাঁসের মাংস উৎপাদিত হয় ১.৯১ লক্ষ মে.টন। নীচের সারণী-৭'এ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মাংস ও বাৎসরিক মাংস উৎপাদন দেখানো হলো

সারণী-৭: উৎস অনুযায়ী মাংস উৎপাদন (২০১৫-১৬)

	মাংস উৎপাদন	গবাদি পশুর সংখ্যা (লক্ষ)	উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	অবদান (%)
১	জবাইকৃত অভ্যন্তরীণ গরুর সংখ্যা	২৩৭.৮৫	২৪.৯৭	৪০.৬০
২	আমদানী ও জবাইকৃত গরু	২৫.০০	৬.২৫	১০.১৬
৩	জবাইকৃত মহিষের সংখ্যা	১৪.৭১	১.৮৪	২.৯৯
৪	জবাইকৃত ছাগল	২৫৭.৬৬	১.৯৮	৩.২৩
৫	জবাইকৃত ভেড়া	৩৩.৩৫	০.২৩	০.৩৮
৬	জবাইকৃত দেশী মুরগি	৯৩৯.৩৮	১.৪১	২.২৯
৭	জবাইকৃত ব্রয়লার মুরগি	১৩৪১.৯৭	২১.৪৭	৩৪.৯০
৮	জবাইকৃত লেয়ার মুরগি	৪০২.৫৯	০.৯১	১.৪৭
৯	জবাইকৃত হাঁস	৫২২.৪০	১.১৮	১.৯১
১০	শূকর	৪.০০	০.১৬	০.২৬

১১	কবুতর	৯০.০০	০.০৫	০.০৯
১২	কোয়েল	২৫.০০	০.০১	০.০১
১৩	খরগোশ	২.০০	০.০০৪	০.০১
১৪	রাজহাঁস	২.০০	০.০১	০.০১
১৫	অন্যান্য (টার্কি, তিতির, উট, দুম্বা, হরিণ ইত্যাদি)	-	১.০৪	১.৬৯
		সর্বমোট =	৬১.৫২	

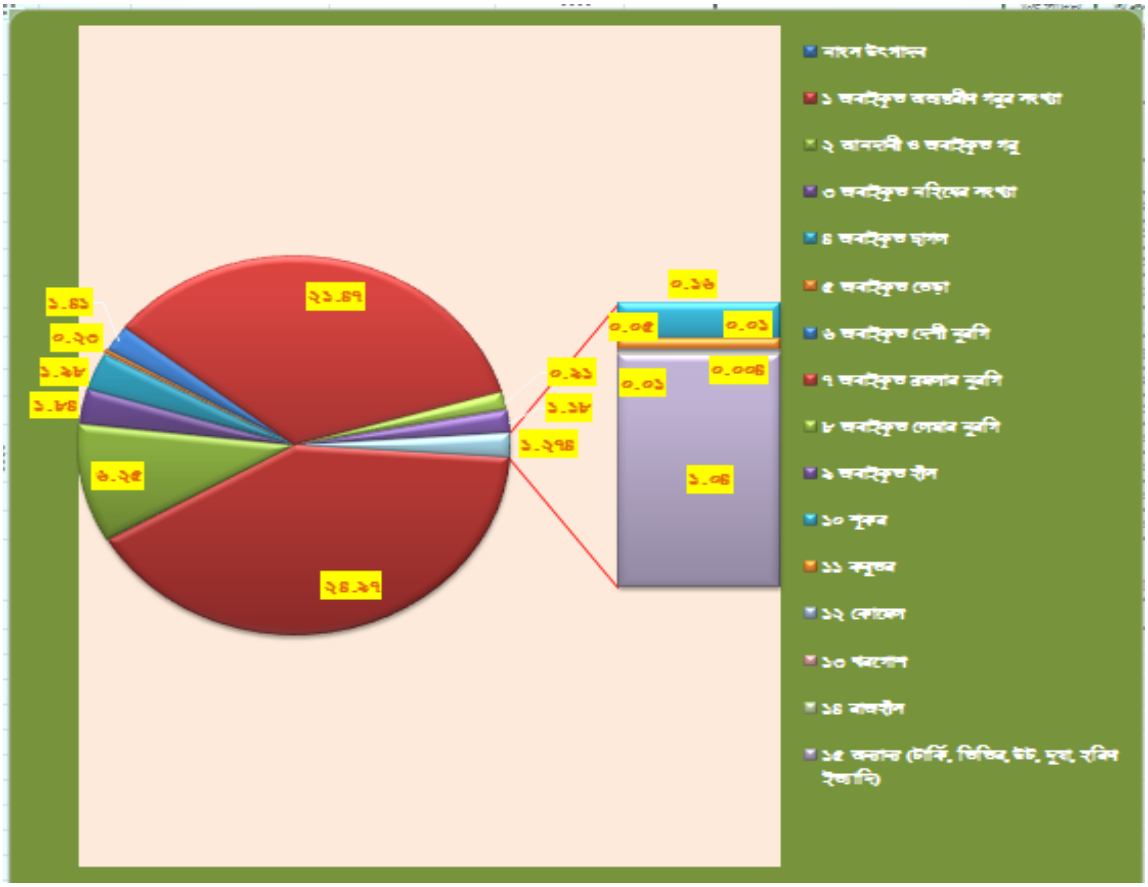

লেখচিত্র-১২: মাংস উৎপাদনের উৎসভিত্তিক চিত্র

বাংলাদেশে মাংস উৎপাদনের সম্ভাবনাঃ মাংসের উৎস ভেদে বিভিন্ন প্রজাতি থেকে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনার কারণে তারতম্য থাকলেও দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কারণে ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল সহজলভ্য হওয়ায় দেশে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবাদি প্রাণির সংখ্যা বৃদ্ধি নয় বরঞ্চ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকেই নজর দিতে হবে। কিন্তু পোল্ট্রির সংখ্যা ও Off take rate বৃদ্ধির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। হালচাষ ও পণ্য পরিবহণের কাজে গবাদি পশু ব্যবহার খুব দ্রুত কমে আসছে এবং এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে প্রতীয়মান হয়। তাই দ্বৈত প্রয়োজনে যে সব গরু ব্যবহার করা হয় সে সব গরু থেকে মাংস প্রাপ্তি ভবিষ্যতে কমে যাবে। অন্যদিকে দেশে অধিক মাংস উৎপাদনে সক্ষম ব্রাহমা জতের গরুর অঞ্চলভিত্তিক সম্প্রসারণ ও ডাবল মাসলড গরুর জাত develop করা

সম্ভব হলে দেশে মাংস উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়া Beef fattening এর আওতায় আরও অধিক সংখ্যক গরু নিয়ে আসতে পারলেও উৎপাদন অনেকাংশে বাড়বে। তবে, জাত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করে, গরুর মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। জাত উন্নয়ন ও Beef fattening এর পাশাপাশি কৃমি দমন, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, খাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে পারলে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কাউন্সিলরগণ বিভিন্ন দেশে হালাল মাংস রপ্তানির জন্য নতুন বাজার অন্বেষণে কাজ করে যাচ্ছে । বর্তমানে এদেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া, মালদ্বীপ ও কুয়েতে হালাল মাংস ও মাংসজাত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশেও মাংস ও মাংসজাত পণ্য (বোন চিপস, গরুর লেজের লোম, বুল স্টিক ইত্যাদি) রপ্তানীর অপার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু , মাংস রপ্তানি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য রোগ নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে এফএমডি (ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ) নিয়ন্ত্রণ, ট্রেসিবিলিটি, জোনিং, উত্তম স্বাস্থ্যবিধি ও পশুপালন চর্চা এবং হালাল সার্টিফিকেশন দরকার। এছাড়াও মাংস ও মাংসজাত পণ্য উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি সহজতর করার জন্য বিনিয়োগ আকর্ষনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূর্তকি এবং ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। একইসাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মনে করে যে হালাল মাংশ ও মাংশজাত পন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অধিদপ্তরকে Accreditation এবং Certification এর ক্ষমতা প্রদান করা উচিত।

৭.৫ ডিম উৎপাদন

ডিম প্রাণিজ আমিষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। স্বল্প মূল্যের একটি ডিম দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যেহেতু ডিমের তুলনামূলক মূল্য অন্যান্য প্রা ণিজ আমিষের তুলনায় কম তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ডিম অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে । ডিম শিশুদেরও প্রিয় খাবার এবং শিশুপুষ্টি কর্মসূচীতে ডিম অন্তর্ভূক্তি শিশুদের অপুষ্টি রোধে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে ।

ডিমের চাহিদা ও যোগান: একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের খাদ্য তালিকায় সপ্তাহে দুটি ডিম অর্থ্যাৎ বছরে ১০৪ টি ডিম অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার । শিশুদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা সপ্তাহে কমপক্ষে ৪ টি এবং বছরে ২০৮ টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা বাংলাদেশে ডিম উৎপাদন বছরে ১১৯১২.৪০ মিলিয়ন। সে অনুযায়ী দেশে মাথাপিছু ডিমের প্রাপ্তি প্রতি বছরে গড়ে ৭৫.০৬ টি।

ডিমের উৎসঃ আমাদের দেশে ডিমের প্রধান উৎস মুরগি ও হাঁস । ডিমপাড়া মুরগি সাধারণত দেশী, সোনালী ও হাইব্রিড (লেয়ার) জাতের হয়ে থাকে । দেশী মুরগি প্রতি বছরে গড়ে ৬০ টি ডিম পাড়ে । বাণিজ্যিক জাতের লেয়ার মুরগি বছরে গড়ে ২ ৫০ টি ডিম পাড়ে । দেশে ডিমের ব্যাপক চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সারণী-৮: উৎস অনুযায়ী ডিম উৎপাদন (২০১৫-১৬)

ডিম উৎপাদন		ডিম পাড়া হাঁস মুরগীর সংখ্যা (লক্ষ)	উৎপাদন (লক্ষ সংখ্যায়)	একক প্রাপ্ত উৎপাদন
১.	বাণিজ্যিক বৃহৎ খামারে লেয়ার মুরগী	৬০.৩৯	১৭৫১২.৬৪	গড়ে ২৯০ টি/মুরগী
২.	মাঝারী খামারে লেয়ার মুরগী	৩৪২.২০	৭১৮৬১.২৩	গড়ে ২২০ টি/মুরগী
৩.	দেশী মুরগী	৩২৮.৭৮	১৯৭২৬.৮৯	গড়ে ৬০ টি/মুরগী
৪.	দেশী হাঁসী	১৩০.১৮	১০০২৪.০২	গড়ে ৭৭ টি/হাঁসী
	সর্বমোট =		১১৯১২৪.৭৭	

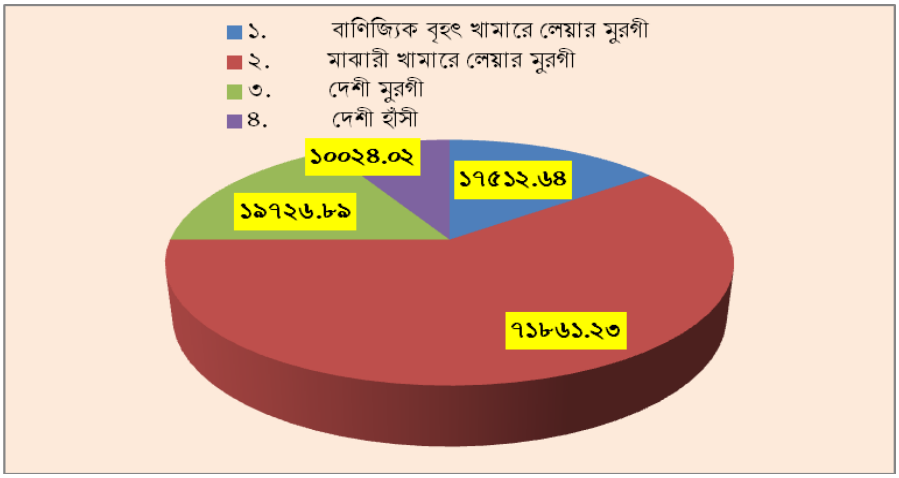

লেখচিত্র-১৩: ডিম উৎপাদনের উৎসভিত্তিক চিত্র

বাংলাদেশে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাঃ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ডিমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে; সে তুলনায় সরবরাহ বর্তমানে অনেক কম। ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব অন্যদিকে এই শিল্প আরও বিকশিত হবে। ফলে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ২০৩১ সাল নাগাদ দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৬০ টি হতে ৮০ টিতে বাড়ানো হলে এবং ডিম পাড়া লেয়ার মুরগির সংখ্যা ৪০২.৫৯ লক্ষের তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে দেশী ডিমের উৎপাদন বছরে ১১৯১২.৪০ মিলিয়ন হতে বেড়ে ২১৭৮০.৩৩ মিলিয়ন হবে। উন্নত বিশ্বে বাণিজ্যিক জাতের লেয়ার মুরগি হতে বছরে গড়ে ২৮০ হতে ৩০০ টি ডিম উৎপাদিত হলেও আমাদের দেশে বাণিজ্যিক জাতের লেয়ার মুরগি হতে বছরে গড়ে ২৯০ টি ডিম উৎপাদিত হচ্ছে। সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে এই সংখ্যা আরও বাড়ানো সম্ভব। উন্নত বিশ্বে হাঁস হতে বছরে গড়ে ২২০ টি ডিম উৎপাদিত হলে আমাদের দেশে হাঁস হতে বছরে গড়ে ৭৭ টি ডিম উৎপাদিত হচ্ছে। হাওড়াঞ্চলসহ দেশের যে সব এলাকায় প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎস রয়েছে সে সব এলাকায় জাত উন্নয়নের মাধ্যমে হাঁসের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানো সম্ভব। ২০৩১ সাল নাগাদ হাঁসের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৭৭ হতে ৯০ টি তে, ২০৪৬ সনে ১৪০টি এবং ২০৬৬ সনে ২০০ টি তে বাড়ানো হলে ডিম উৎপাদন ২০৪৬ সনে ২৭৭২৮.৩৩ মিলিয়ন এবং ২০৬৬ সনে ৩৫৬৫৯.০০ মিলিয়নে উন্নীত হবে।

৭.৬ প্রাণি উৎসের রোগ প্রতিরোধ এবং দমন

প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও প্রাণি উৎস থেকে রোগ ব্যাধি যাতে মানব দেহে সংক্রমিত হতে না পারে সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে মানুষে সংক্রমিত প্রায় ৭০% রোগের উৎস পশু -পাখি। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সাম্প্রতিক সময়ে শূকরের ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যাডকাউ রোগের সংক্রমণ প্রাণি উৎসের রোগ প্রতিরোধ এবং দমনের গুরূত্ব অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

করনীয়: প্রাণি উৎসের রোগ প্রতিরোধ ও দমনকে অনেক অনুষঙ্গ সম্মিলিত ভাবে প্রভাবিত করে। তবে , উৎসে রোগ দমন এ ধরণের রোগ প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায়। বড় দাগে ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ কার্যক্রম পরিচালনায় একটি দক্ষ ভেটেরিনারি সার্ভিস, ওয়ান হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ, জুনোটিক রোগসহ প্রানিরোগ সার্ভিলেন্স ব্যবস্থার কার্যকর উপস্থিতি, শক্তিশালী ইপিডেমিওলোজি সেল, নিয়মিত জবাই পরিদর্শন ব্যবস্থা, পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন, কার্যকর সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থা ও জনসচেতনা সৃষ্টি অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ, যা প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনায় অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে নিধারন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাণি রোগ নির্ণয় কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে গবেষণাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন ও এক্রেডিটেশনের প্রস্তাব রয়েছে।

৭.৭ রপ্তানি উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় উপ-খাত। অদূর ভবিষতে দেশের জনগনের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরনের পাশাপাশি প্রাণিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদোগ্যে স্বল্প পরিসরে প্রক্রিয়াজাত প্রাণিজ পন্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কিন্তু ভবিষতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা গেলে এ খাত থেকে আরও বৈদিশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। আর তাই প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় এ বিষয়টিকে সর্ব্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং নিম্নে বর্ণিত সারণী-৯ এবং লেখচিত্র-১৪ ও ১৫ এর মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশলের আলোকে বছরওয়ারী প্রক্ষেপন নির্ধারন করা হয়েছে।

সারণী-৯: মেয়াদভিত্তিক প্রাণিজ পণ্য রপ্তানীর প্রক্ষেপণ (প্রতি বছর):

রপ্তানী পণ্য	স্বল্পমেয়দী (২০১৭-২০৩১)		মধ্যমেয়দী (২০৩২-২০৪৬)		দীর্ঘমেয়দী (২০৪৭-২০৬৬)	
	কাঁচামাল রপ্তানী (লক্ষ মে. টন)	প্রক্রিয়াজাত পণ্যের (শতকরা) রপ্তানী	কাঁচামাল রপ্তানী (লক্ষ মে. টন)	প্রক্রিয়াজাত পণ্যের (শতকরা) রপ্তানী	কাঁচামাল রপ্তানী (লক্ষ মে. টন)	প্রক্রিয়াজাত পণ্যের (শতকরা) রপ্তানী
দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য	-	১০	-	২৫	-	৪০
মাংস ও মাংসজাত পণ্য	-	১৫	-	২৫	-	৫০
প্রাণিজ উপজাত	৫.০০	১৫	২.০০	৩০	১.০০	৫০

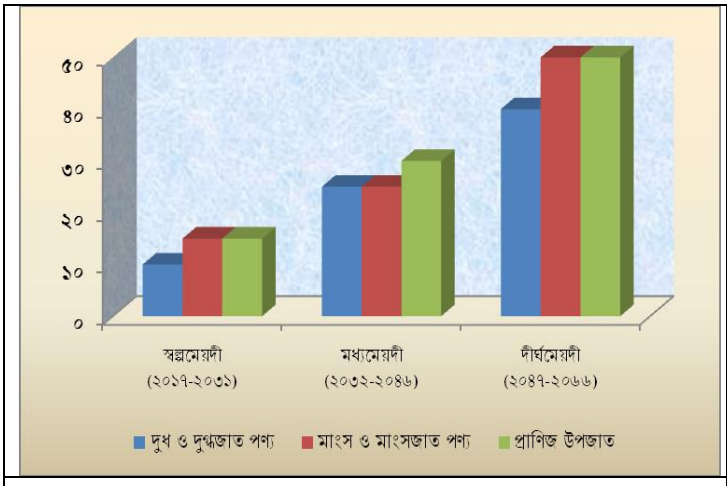

লেখচিত্র-১৪: মেয়াদভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত প্রাণিজ পণ্যের শতকরা রপ্তানীর চিত্র

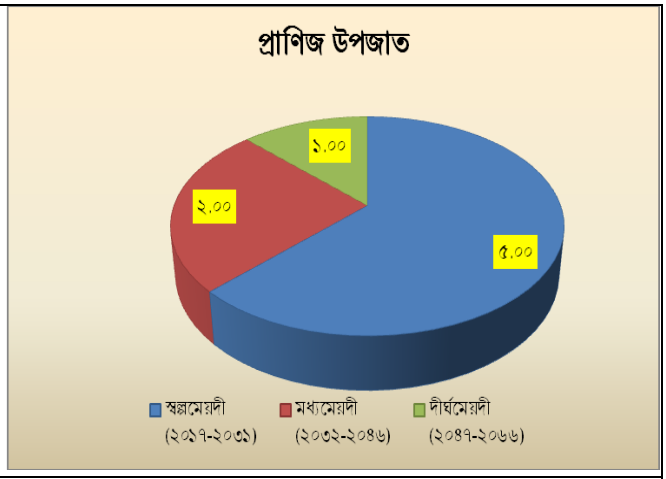

লেখচিত্র-১৫: মেয়াদভিত্তিক প্রাণিজ পণ্যের কাঁচামাল রপ্তানীর চিত্র

৭.৮ ডাটাবেজের উন্নয়ন ও ডিজিটালাইজেশন

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ দূরত্ব আর সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছে অভাবনীয় দ্রুততম সময়ে। সামাজিক যোগাযোগ যেমন বাড়ছে মানুষে মানুষে, তেমনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯০ এর দশক থেকে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও উন্নয়ন কর্মকান্ডে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, ব্যবসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ক্ষুধা, দারিদ্র মুক্ত দেশ গড়ার জন্য ২০২১ সালের মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ব্যবসা ও পরিবেশের উন্নয়ন, পরিবার প্রতি নূন্যতম একজনের কর্মসংস্থান ঘটিয়ে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করার জন্য রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করছে। দেশকে তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারিভাবে ইতোমধ্যে নানা ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে সমাপ্ত ‘‘এনহ্যান্স দি ক্যাপাসিটি অফ ডিএলএস’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি ওয়েবসাইট (www.dls.gov.bd) চালু করা হয়। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যাদি জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- খামার স্থাপন বিষয়ে কারিগরী তথ্যাদি ও পরামর্শ, হাঁস-মুরগীর বাচ্চা, ডিম ইত্যাদি উপকরণ পাওয়ার তথ্য ও সরকার নির্ধারিত মূল্য, পশু-পাখির রোগ, লক্ষণ, প্রতিকার ও চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি। সম্প্রতি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদান চালু হয়েছে। জনসাধারণ মোবাইল ফোনে এস.এম.এস এর মাধ্যমে বিনামূল্যে গবাদি-

পশু ও হাঁস-মুরগীর প্রাথমিক চিকিৎসা, পালন পদ্ধতি, খাদ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সেবা পাচ্ছে। প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনায় অদূর ভবিষতে প্রানিসম্পদ খাতে আরো যুগপোযুগি তথ্য প্রযুক্তি সেবা সম্পৃক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

৭.৯ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রাণিসম্পদ খাত বিশ্বের অন্যতম গতিশীল খাত। উন্নত অপেক্ষা উন্নয়নশীল দেশে এর উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমাগত টেকসই পরিবেশ ও দক্ষতামুখী হচ্ছে। ভবিষ্যতে, বিশেষতঃ ভূমি ও পানি, খাদ্য ও খাদ্যসামগ্রীর জন্যে প্রতিযোগীতা এবং কার্বন সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা জনিত কারনে উৎপাদন ব্যবস্থা প্রাকৃতিক সম্পদ এর প্রাপ্যতার প্রতিযোগিতায় ক্রমাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। প্রাণিসম্পদ এর যথাযথ উন্নয়ন, পরবর্তী দক্ষতা ও কৌলিক উন্নয়ন এ প্রজনন, পুষ্টি ও প্রাণিস্বাস্থ্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবদান রাখবে। কার্বন নিস:রণ, পরিবেশগত ও প্রাণিকল্যান আইনি সীমাবদ্ধতাজনিত কারনে প্রানিসম্পদ ক্রমাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের চাহিদা ভবিষ্যতে আর্থ-সামাজিক যেমন, মানব স্বাস্থ্য ও সমাজ-সংস্কৃতিমূলক মূল্যবোধের বিবর্তন ধারার কারনে দারুনভাবে প্রভাবিত হবে। আসন্ন দশকে বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলে এ প্রভাবকগুলো কেমন ভাবে কাজ করবে তা এক বিবেচনা যোগ্য অনিশ্চয়তায় নিপতিত।

সামগ্রীক কৃষিখাত কার্বনডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) এবং নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2) নিঃসরনের মাধ্যমে আনুমানিক ২০% নিঃসৃত গ্যাস এর অংশীদার। প্রাণিসম্পদ শিল্প ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার জন্যে ৫-১৯% ভূমিকা রাখে। কৃষি খাতের নিঃসৃত গ্রীন হাউজ গ্যাস এর মধ্যে মিথেনই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ (৯১%) মিথেন নিঃসরন হয় ধান ক্ষেত থেকে; অতঃপর পশুপালন (৭%) এবং কৃষি বর্জ্যের জ্বালানী (২%) হতে। প্রাণিসম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট গোবর ব্যবস্থাপনা হতে সর্বসমেত ১৬% মিথেন উৎপাদিত হয়। উক্ত পরিমানের মিথেন নিঃসরন সরাসরি গরু-মহিষের আঁশ জাতীয় ঘাস হজম প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন যা মানুষ, শূকর বা মুরগীর পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু-মহিষই ৮০% মিথেন উৎপাদন ও নিঃসরনের জন্য দায়ী। আবদ্ধ পদ্ধতিতে লালনপালনকৃত গবাদিপশু কম পরিমানে মিথেন উৎপাদন করে। কারণ উন্নত মানের কম আঁশযুক্ত খাবার সরবরাহ পায়। সুতরাং উন্নত মানের খাবার সরবরাহ, আবদ্ধ পালন, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং পশু বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ বায়োমাস জ্বালানো কমানোর মাধ্যমে মিথেন উৎপাদন সীমিত রাখা সম্ভব। এবং এ পদ্ধতিতে মিথেন এর উৎপাদন কৃষি খাতের ভূমিকার ১৫-৫৬% কমানো সম্ভব। নাইট্রাস অক্সাইড নিঃসরনও কমানো সম্ভব যদি নাইট্রোজেন সার, উন্নত প্রাণি চিকিৎসা এবং পশু বর্জ্যের কার্বন ব্যবস্থাপনা যথাযথ করা যায়।

প্রাণিসম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

প্রাণিসম্পদ এবং ডেইরী উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। জলবায়ু শস্য চাষাবাদ প্রক্রিয়া এমনকি রোগ বাহকের বিন্যাস পরিবর্তনেও পশুপালন আক্রান্ত হওয়ার শংকামুক্ত নয়। উষ্ণমন্ডলীয় এলাকায় অতি উচ্চ তাপমাত্রা জনিত কারণে নিম্নমুখী ডেইরী উৎপাদন, প্রাণির কাংখিত ওজন বৃদ্ধি না হওয়া, বৈচিত্রপূর্ণ প্রজনন এবং নিম্নমুখী খাদ্য পরিপাক দক্ষতা সমূহ শংকার বিষয়। শীত প্রধান এলাকায় এ প্রভাব আরো অধিক মিশ্র হিসেবে অনুমেয়। পশুর খাদ্য গ্রহণে অনীহাও বৃদ্ধি পাবে যদি উষ্ণমন্ডলীয় এলাকায় শীতের তীব্রতা ও স্থায়ীত্ব উষ্ণায়ন বৃদ্ধির ফলে কম হয়। এছাড়া, অধিকতর খরার প্রাদুর্ভাব ঘাস উৎপাদন

কমাতে পারে এবং উচ্চ তাপমাত্রা চারনভূমিতে আন্তঃ প্রজাতির ঘাসের অস্তিত্ব বিবর্ন করতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তন প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগীর উৎপাদনে ভেটেরিনারি ঔষধের খরচও বৃদ্ধি করে। বর্ধিত তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রাণির খাদ্যে আফ্লাটক্সিন উৎপাদনের ঝুঁকিও বৃদ্ধি করে; ফলশ্রুতিতে প্রাণির মধ্যে বিষক্রিয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। অধিকাংশ রোগবালাই যেহেতু বাহক (যেমন: মশা, আটালী, মাছি, ঝিনুক-শামুক ইত্যাদি) এর মাধ্যমে সংক্রমিত হয়, তাদের ক্রমবিকাশের ধাপগুলো যেহেতু প্রায়শঃই অধিকতর তাপমাত্রা নির্ভর সেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন এর ফলে প্রাণিসম্পদের রোগের প্রাদুর্ভাবও বাড়তে পারে।

যুক্তিগ্রাহ্যভাবে, জলবায়ুজনিত প্রভাবে কৃষকদেরকে তিন ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে-(১) প্রত্যক্ষ (প্রাণিসম্পদ উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি), (২) পরোক্ষ (আর্থ-সামাজিক ও উন্নয়ন বঞ্চনা) ও (৩) অভিযোজন খরচ। আর তাই জলবায়ূর বিরুপ প্রভাব হতে গবাদিপশু এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার কৌশল হিসেবে প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনায় জলাবায়ূ খাতকে গুরুত্ব প্রদানকরত: বিভিন্ন কর্মকৌশলকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে যথা: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাণিসম্পদের নতুন আবির্ভাবযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত সার্ভিল্যান্স করা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাণিরোগ সম্পর্কিত গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণার উন্নয়ন ও যথাযথ ফিড ফরমুলেশনের মাধ্যমে মিথেন নি:সরণ হ্রাসকরণ, পশুবর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধসহ অন্যান্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহনের প্রস্তাবনা রয়েছে। একইভাবে সময়ের তাগিদে বিভিন্ন আইনী কাঠামো বাস্তবায়নেরও প্রস্তাব করা হয়েছে যথা : Formulation of National Animal Health Disaster Committee, Formulation of Waste Management and Wet Market Phase Out Policy, Establishment of new wing for ONE Health services ইত্যাদি। তবে যেহেতু এ কার্যক্রম এককভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয় সেক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহনও জরুরী।

৭.১০ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সারা দেশে গবাদি পশু ও পোল্ট্রির রোগ নির্নয় , চিকিৎসা, পরামর্শ, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন , প্রযুক্তি সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন সম্প্রসারনমূলক সেবা প্রদান করে থাকে। উপজেলা প্রা ণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রসমুহ (ইউএলডিসি) প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি ইউএলডিসি চিকিৎসা সেবা ও সম্প্রসারন কাজ করে থাকে। অপ্রতুল জনবল , সাপোর্ট সার্ভিসের অভাব ও জনবলের প্রশিক্ষনের অভাব থাকা সত্বেও প্রাণিসম্পদ দপ্তর পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে । খামারীদের সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। খামার ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন হচ্ছে। ব্রীড ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে গবাদি পশু ও পোল্ট্রির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে প্রাণিসম্পদ সেবার চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাড়তি চাহিদা ১৯৮৩ সালের প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সেট আপ দ্বারা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

দেশের কৃষি তথা সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সম্প্রসারণ সেবা একটি প্রধান অনুঘটক। জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ এবং জটিলতামুক্ত নাগরিক সেবা ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থপূর্ণ হতে পারে না। দেশের জন মুখী সেবা কার্যক্রম শুরু থেকে এ পর্যন্ত নিত্যনতুন কাজের মাত্রা তিনগুণ বা তার বেশী হলেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোর আকার একই রয়ে গেছে। ইতোমধ্যে দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ এবং কাজের মাত্রার বহুমুখীকরণ হলেও সে অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

আশানুরূপ হয়নি। ফলে, এ দুর্বল এক্সটেনশন সেবার মাধ্যমে সময়োপযোগী এবং চাহিদা -ভিত্তিক সেবা প্রদান করা প্রায়শই সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনকাঠামো গঠন করা হয়েছিল ৭০ এর দশকে মূলত পারিবারিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে। ১৯৮৩ সালের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেট আপ এর আলোকে বর্তমানে ডিএলএস -এ গ্রেড-১ হতে গ্রেড-২০ পর্যন্ত মোট ৯৫৫৭ টি পদ রয়েছে (লেখ চিত্র-১৬)। এর মধ্যে বর্তমানে ডিএলএস-এ ১৫২৫ জন ক্যাডার অফিসারের পদ রয়েছে এবং বাকী পদগুলি নন-ক্যাডার এবং কর্মচারীরা কর্মরত। কিন্তু এ সকল পদের মোট ১৫৬টি প্রথম ও ৭টি দ্বিতীয় শ্রেনীর পদ এবং মোট ১৭৮২টি কর্মচারীর পদ প্রশাসনিক ও অবসরজানিত কারণে শূন্য রয়েছে (সেপ্টেম্বর, ২০১৭ অনুযায়ী)। ফলে মাঠ পর্যায়ে এন্ট্রি লেভেল অফিসার ও কর্মচারীর শূন্যতার কারণে পশুচিকিৎসা, উৎপাদন ও সম্প্রসারণ সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম সারাদেশে প্রায়শ:ই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যদিও উৎপাদনশীল ও বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যবস্থার তাৎক্ষনিক চাহিদা পূরণে সময়ে সময়ে প্রকল্প ভিত্তিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও সমসাময়িক এবং আগামী দিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে অধিদপ্তরের জনকাঠামো সুষম করণের কোন উদ্যোগ এর আগে নেয়া হয়নি। মূলত বর্তমান ও আগামী দিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই কর্মকাঠামো পুনর্গঠনের একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল।

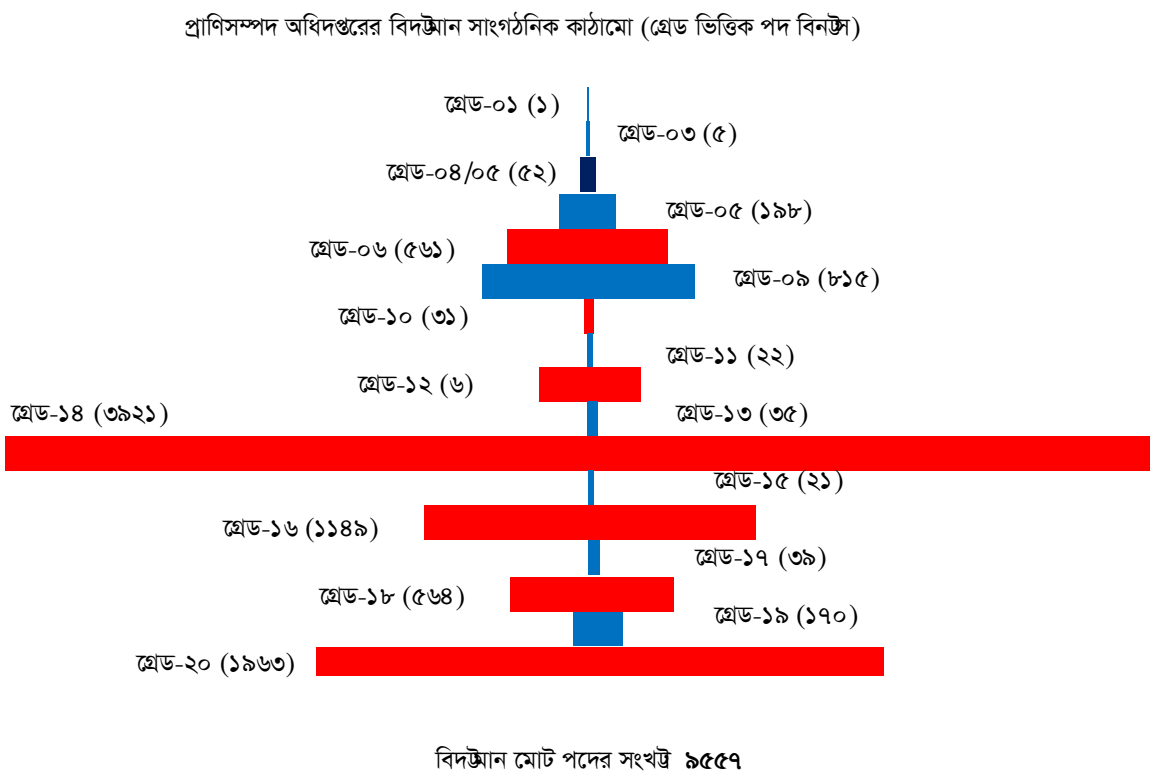

লেখচিত্র-১৬: ১৯৮৩ সালের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেট আপ এর আলোকে লোকবলের বর্তমান অবস্থা।

প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থার উত্তরণের জন্য প্রয়োজন প্রস্তাবিত নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদন এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণি সম্পদ কর্মীর পদ সৃষ্টি করত: প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন সাধন। আর এ লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য গ্রেড-১ হতে গ্রেড-২০ পর্যন্ত মোট ৩১৫৫২ পদের নতুন অর্গানোগ্রাম এর প্রস্তাব মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনের শেষ ধাপে রয়েছে (লেখচিত্র-১৭)। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত এ অর্গানোগ্রামে পরিবর্তিত সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বেশ কিছু নতুন খাতে সেবা অবকাঠামো সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে যেমন প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, বহিরাগত সংক্রামক রোগ অনুপ্রবেশ রোধ কল্পে এনিম্যাল কোয়ারেনটাইন, এপিডেমিওলজি, বিপনন (অতিরিক্ত মহা-পরিচালক ফিল্ড সার্ভিসের অধীন , প্রাণিসম্পদ বিপনণ দপ্তর) , ইনফরমেশন এন্ড আইটি (অতিরিক্ত মহা-পরিচালক প্রশাসন, অর্থ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের অধীন, ইনফরমেশন এন্ড আইটি শাখা) ইত্যাদি।

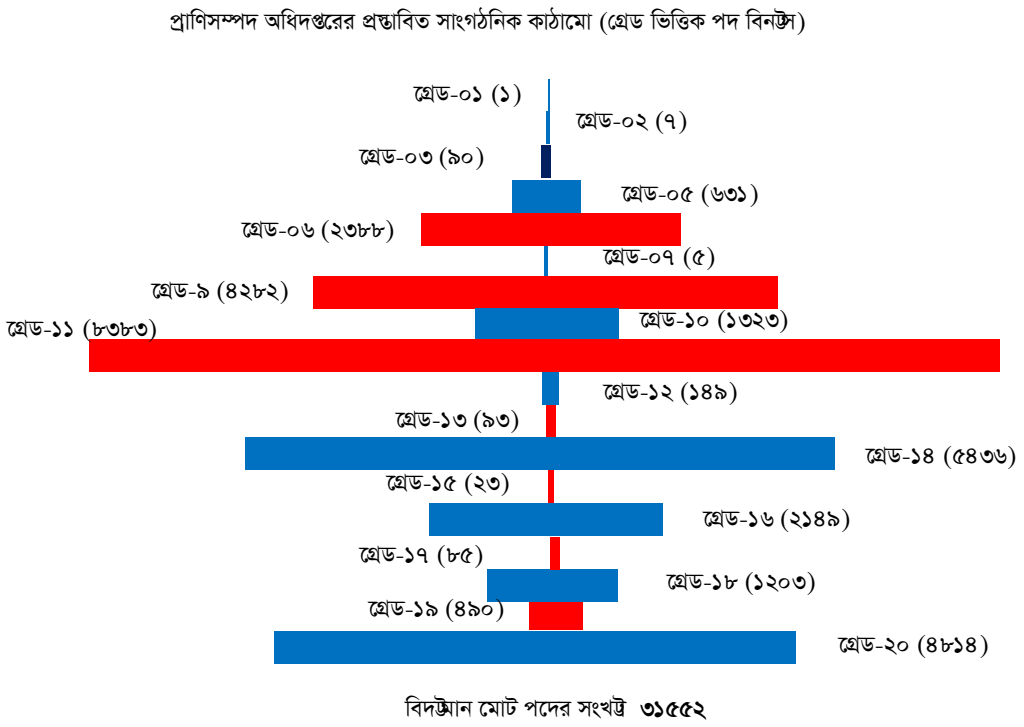

লেখচিত্র-১৭: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত নতুন অর্গানোগ্রাম।

এছাড়া বর্তমান সেবা সমূহকে জনস্বার্থ ও চাহিদা বিবেচনায় সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে মানসম্মত ও যুগোপযোগী প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারণ, রোগ অনুসন্ধান, বায়োলজিকস (টীকা) উৎপাদন, উপকরণ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন খামার স্থাপন, কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্র সমূহের উল্লেখযোগ্য পুনর্গঠণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত এ অর্গানোগ্রাম অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষম তা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেবা র মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত প্রানিসম্পদ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকৌশল নির্ধারন করা হয়েছে যথা: প্রাণিসম্পদ নলেজ সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে,যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে খামা রীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং একইসাথে জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা হবে , দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা (বিশেষ করে নারী) সৃষ্টিকরণ এবং ২০৩১ সালের মধ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রাণিসম্পদ অ ধিদপ্তরের সদর দপ্তর স্থাপন , বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মপরিবেশের উন্নয নের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সকল কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে অদূর ভবিষ তে প্রাণিসম্পদ একটি লাভজনক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

৮. একনজরে প্র স্তাবিত ভবিষত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের যে সকল ক্ষেত্রে (Key Performace Indicator, KIP) উন্নয়ন (স্থির বৎসরে) সাধিত হবে:

ক্রমিক নং	Key Performace Indicator, KIP	স্থির বৎসরে অর্জন (২০১৫-২০১৬, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা
১	আমিষের ঘাটতি পূরণ (মাংশ, দুধ এবং ডিম উৎপাদন)	দুধ: ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে দুধ উৎপাদন ৭ দশমিক ২৭ মিলিয়ন মে.টন	পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৭-২০৩১ অর্থবছরে ১৪ দশমিক শূন্য ৩, ২০৩২-২০৪৬ অর্থবছরে ২০ দশমিক ৮৯ এবং ২০৪৭-২০৬৬ অর্থবছরে ৩০ দশমিক শূন্য ৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন।
		মাংশ: ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মাংশ উৎপাদন ৬ দশমিক ১৫ মিলিয়ন মে.টন	পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৭-২০৩১ অর্থবছরে ৯ দশমিক শূন্য ২, ২০৩২-২০৪৬ অর্থবছরে ১২ দশমিক ১০ এবং ২০৪৭-২০৬৬ অর্থবছরে ১৬ দশমিক শূন্য ২১ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন।
		ডিম: ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ডিম উৎপাদন ১১৯১২.৮০ মিলিয়ন	পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৭-২০৩১ অর্থবছরে ২১৭৮০.৩৩, ২০৩২-২০৪৬ অর্থবছরে ২৭৭২৮.৩৩ এবং ২০৪৭-২০৬৬ অর্থবছরে ৩৫৬৫৯.০০ মিলিয়ন উৎপাদন।
২	প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে: ➢ গবাদিপশুর স্বাস্থ্য রক্ষা ➢ জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং ➢ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিয়তা	প্রস্তাবিত কমপরিকল্পনায় স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশল দ্বারা প্রাণি উৎস হতে সৃষ্ট বা প্রাণিজনিত রোগসমূহ পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ভেটেরিনারি সার্ভিস, ওয়ান হেলথ সার্ভিস, জুনোটিক রোগসহ প্রানিরোগ সার্ভিলেন্স ব্যবস্থার জোরদারকরণ, শক্তিশালী ইপিডেমিওলোজি সেল গঠন, পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন, কার্যকর সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থা ও জনসচেতনা সৃষ্টি মাধ্যমে গবাদিপশু এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধান। সর্বোপরি যথাযথ প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন।	
৩	কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে তথ্যানুযায়ী এদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গবাদিপ্রাণির উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ এবং ৫৫ ভাগ লোক পরোক্ষভাবে গবাদিপ্রাণির উপর নির্ভর করে। এ সময়ে	পরিকল্পনা অনুযায়ী পোল্ট্রি শিল্পে ২০১৭-২০৩১ অর্থবছরে প্রায় ৪৫ লক্ষ, ২০৩১-২০৪৬ অর্থবছরে প্রায় ৬০ লক্ষ এবং ২০৪৭-২০৬৬ অর্থবছরে প্রায় ৯০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি। আর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে সাথে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে র মাধ্যমে সমানুপাতিকভাবে

		শুধুমাত্র পোল্ট্রি শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে ৩০ লক্ষ নিযুক্ত	দারিদ্র্যের হার হ্রাস।
৪	রপ্তানি আয় বৃদ্ধি	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর Foregin Trade Statistics (FTS) হতে জানা যায় যে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ চামড়াজাত পন্য হতে ২০২৪.১০ কোটি টাকা , মাংশ ও মাংশজাত উপজাত হতে ৯.৮৮ কোটি, প্রক্রিয়াজাত তরল দুধ ও দুধজাত পন্য ১৫.৯৭ কোটি এবং প্রাণিজজাত উপজাত হতে ১২৬.৮১ কোটিসহ সর্বমোট ২১৭৬.৭৭ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।	প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনায় চামড়াজাত পন্য, প্রানিজ উপজাত, প্রক্রিয়াজাত দুধ ও দুধজাত পন্য এবং মাংশ ও মাংশজাত উপজাত রপ্তানির মাধ্যমে স্থির বৎসরে পর্যায়ক্রমে বর্তমানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ২৫, ৪০ এবং ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হবে।
৫	প্রাণিসম্পদ সর্ম্পকিত বিধি ও আইন	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ সর্ম্পকিত প্রচলিত আইন বা বিধিসমূহ হলো : পশুরোগ আইন, ২০০৫ ও তদাধীনে প্রণীত পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮; মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও তদাধীনে প্রণীত পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩; পশু ও পশুজাত পণ্য সংগনিরোধ আইন, ২০০৫; পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১; The Bengal Cruelty to Animals Act, 1920 এবং The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982 রয়েছে।	প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনায় প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচলিত কিছু কিছু আইন ও বিধিমালায় পরিবর্তন আনা হবে। এছাড়াও নতুন নতুন বিভিন্ন আইন ও পলিসি প্রনণয়ন করা হবে যথা: Formulation of Livestock Extension Policy; Formulation of Dairy Development Policy, Establishment of National Veterinary Epidemiology Institute, Introducing livestock Insurance Policy, Introducing Animal Breeing Act, Livestock Products & By-products Export Policy ইত্যাদি।
৬	তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন	➢ প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনায় বিদ্যমান তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং নতুন প্রযুক্তি ও সেবা সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন সেন্টারে এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিটি বিভাগে এবং জেলা প্রাণিসম্পদ কমপ্লেক্সে ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা । এ ডকুমেন্টেশন সেন্টার বিদ্যমান ই -তথ্যাদি, প্রতিবেদন, ভিডিও কনটেন্ট , ছবি, ডিপিপি এর সফট কপি , প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল , পত্রিকা, ম্যাগাজিন, প্রকাশনা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা এবং সম্প্রসারণে ব্যবহার করা হবে। ➢ দেশে রোগজনিত কারণে পশুমৃত্যুর সংখ্যা, অর্থনৈতিক ক্ষতি নিরূপণ, প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন, উৎপাদন খরচ, প্রাণিসম্পদ খাতে আর্থ-সামাজিক সংশ্লেষ, প্রাণিজাত পণ্যের আমদানী-রপ্তানী ইত্যাদি বিষয়ে বেজলাইন ডাটাবেজ সৃষ্টির জন্য বিবিএস এর সাথে যৌথ উদ্দোগে নিয়মিত সার্ভে করা ➢ জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যবহার করে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা ➢ দুধ, মাংস, ডিম ও অন্যান্য প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণের সুবিধার্থে দেশের প্রতিটি ছোট-বড় প্রাণিসম্পদ প্রতিষ্ঠান ও খামারকে অনলাইন নিবন্ধনের	

		আওতায় আনা হবে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনলাইন ডাটাবেজের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। ➢ ২০৪৬ সনের মধ্যে দেশের প্রতিটি বৃহৎ প্রাণির (Large Ruminant) ইলেকট্রনিক ট্র্যাকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করা ➢ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সকল সেবা অনলাইনভিত্তিক প্রদান। ➢ তাৎক্ষণিক দুর্যোগ প্রশমনের জন্য স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে ক্ষতি নিরূপণ ও দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা	➢ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাণিসম্পদের নতুন আবির্ভাবযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত সার্ভিল্যান্স। ➢ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাণিরোগ সম্পর্কিত গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল উদ্ভাবন। ➢ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণার উন্নয়ন ও যথাযথ ফিড ফরমুলেশনের মাধ্যমে মিথেন নি:সরণ হ্রাসকরণ। ➢ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত জুনোটিক রোগ সম্পর্কিত গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল উদ্ভাবন। ➢ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাণিসম্পদের ক্ষতি প্রশমন ও অভিযোজন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন। ➢ প্রতিকূল পরিবেশে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য গবেষণালব্ধ অর্থাশ্রয়ী নব প্রযুক্তির উদ্ভাবন। ➢ লবনাক্ততা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল ঘাস উৎপাদন। ➢ ইন্টিগ্রেটড লাইভস্টক ম্যানিউর ম্যানেজমেন্ট নীতিমালার বাস্তবায়ন। ➢ পশুবর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ। ➢ প্রাণিরোগের বাহক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ। ➢ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে একটি দুর্যোগ মোকাবেলা সেল গঠন। ➢ তাৎক্ষণিক দুর্যোগ প্রশমনের জন্য স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে ক্ষতি নিরূপণ ও দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।
৮	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	➢ দ্রুততম সময়ের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুমোদন ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ সেবা সম্প্রসারণ। ➢ ২০৩১ সালের মধ্যে জাতীয় ভেটেরিনারি ইপিডেমিওলোজি ইনস্টিটিউট, হ্যাচারী ও এ্যানিমেল ফিড রেগুলেটরি কাউন্সিল এবং জাতীয় ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন। ➢ কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার ও প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগারের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এক্রেডিটেশন। ➢ ২০৩১ সালের মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ONE Health Services, দুর্যোগ প্রশমন, আমদানী-রপ্তানী, ফুড সেফটি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তথ্য প্রযুক্তি এবং পশুবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নতুন সেল গঠন। ➢ ২০৪৬ সালের মধ্যে প্রাণিসম্পদ বিপণন অধিদপ্তর সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ। ➢ ২০৪৬ সালের মধ্যে স্বতন্ত্র National Veterinary Drugs Regulatory Authority প্রতিষ্ঠা। ➢ ভেটেরিনারি ভ্যাক্সিন সিড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, জাতীয় ডেইরি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জাতীয় পোল্ট্রি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জাতীয় পেট এ্যানিমেলস রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জাতীয় ছাগল ও ভেড়া রির্সাচ ইনস্টিটিউট ও জাতীয় ল্যাবরেটরি এ্যানিমেলস রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন।

		➢ অন্ত: ও বহি : পরজীবী, প্রোটোজোয়া, ফাংগাই, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের ডিএনএ/আরএনএ এর নিওক্লিওটাইড সিকোয়েন্সিং এবং নিওক্লিওটাইড (টেমপ্লেট) ব্যাংক স্থাপন। ➢ ২০৬৬ সালের মধ্যে Semen & Embryo ব্যাংক স্থাপন। ➢ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াত, প্রাণি পরিবহন ও প্রাণিজ পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। ➢ দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ এবং প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা (বিশেষ করে নারী) সৃষ্টিকরণ। ➢ ২০৩১ সালের মধ্যে আধুনিক সুযোগ -সুবিধা সম্বলিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর স্থাপন, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্ম - পরিবেশের উন্নয়ন। ➢ ২০৪৬ সালের মধ্যে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে প্রাণিসম্পদ নলেজ সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে খামারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং একইসাথে জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা হবে। ➢ প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ ডাটাবেজ সৃষ্টি, অনলাইন রিপোর্টিং এবং অনলাইন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন। ➢ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রিসার্চ-এক্সটেনশন বন্ডেজ সুদৃঢ়করণ। ➢ সর্বোপরি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতার উন্নয়ন।

৯. মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকল্পে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেকর্মকৌশল নির্ধারন:

৯.১ মেয়াদভিত্তিক দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশলগত পরিকল্পনা (সারণী-১০)

মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	কৌশলগত পরিকল্পনা
স্বল্পমেয়াদী (২০১৭-২০৩১)	❖ দুধ উৎপাদন ১৪.০৩ মিলিয়ন মে. টনে উন্নীতকরণ ❖ উৎপাদিত দুধের ২০ ভাগ আনুষ্ঠানিক (Organized) প্রক্রিয়াজাতকরণ	● ২০৩১ সাল নাগাদ ৭৫% গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন। ● ডিএলএস ব্যাতীত অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম মনিটরিং ও রেগুলেটরি ব্যবস্থার উন্নয়ন। ● কৌলিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের জন্য ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ। ● দৈনিক গড়ে ১০ লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সংকর জাতের গাভী উৎপাদন। ● অঞ্চলভিত্তিক বিশেষত: দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় এবং হাওড় এলাকাসমূহে মহিষের সংখ্যাগত উৎপাদন বৃদ্ধি। ● কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ৪০ ভাগ মহিষের জাত উন্নয়ন। ● মহিষের সিমেন উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার নির্মাণ। ● প্রতিটি জেলায় ১টি করে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন। ● গরু/মহিষের ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। ● শতভাগ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কৃত্রিম প্রজননের ডাটা সংরক্ষণ। ● গাভীর অনুর্বরতা (ইনফার্টিলিটি) ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● ৪০০০ টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ডিএলএস এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনকে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে অনুর্বরতা জনিত রোগ (রিপ্রডাক্টিভ ডিজিজ) সনাক্তকরণের ও চিকিৎসা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ● কৃমিনাশক সেবনের আওতাধীন গাভীর সংখ্যা ৫০% বৃদ্ধিকরণ। ● ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন গবাদিপশুর সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধিকরণ। ● ম্যাসটাইটিস রোগজনিত ক্ষতি কমপক্ষে ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● সরকারি গবেষনাগারে ভ্যাক্সিন উৎপাদ ন বৃদ্ধি, ভ্যাক্সিনের মান নিয়ন্ত্রণ, সুনির্দিষ্ট রোগের বিরূদ্ধে নিবিড়/কৌশলগত টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন। ● বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত ভ্যাক্সিন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও উদ্বুধকরণ। ● সার্কুলেটিং ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া Identification ও Characterization কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ● মাঠ পর্যায়ে সরকা রি ও সমাজভিত্তিক ভেটেরিনারি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদিপশুর রোগ-ব্যাধি ২৫ ভাগ হ্রাসকরণ। ● দুগ্ধ সংরক্ষণ ও বিপনণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ● গুঁড়ো দুধ আমদানীর পরিমাণ ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● GIS (Geographic Information System) -এর মাধ্যমে দেশের অধিক দুধ উৎপাদনশীল এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করে ডেইরি হাব সৃষ্টিকরণ। ● অধিক দুধ উৎপাদনশীল এলাকাসমূহে কমপক্ষে ১০০টি ডেইরি হাব সৃষ্টিকরণ। ● দেশের দুগ্ধজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

		• প্রাণি-পুষ্টি শাখার গবেষণাগারের আধুনিকায়ন ও এক্রেডিটেশন। • অপ্রচলিত উৎস্য থেকে পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। • প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধ পণ্যের কমপক্ষে ১০ ভাগ রপ্তানী করার ব্যবস্থা গ্রহণ। • সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় ২০ ভাগ নতুন ভোক্তা সৃষ্টিকরণ। • বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইনসেনটিভ প্রদানের মাধ্যমে টিএমআর (টোটাল মিক্সড রেশন) কারখানা চালুকরণ। • রপ্তানীমুখী শিল্প সম্প্রসারণ এবং দুগ্ধজাত পন্য রপ্তানী বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন। • বর্তমানের চেয়ে আরও ১০ শতাংশ জায়গায় উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদনশীল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি করে ঘাসের বাজার সৃষ্টিকরণ। • দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের গুনাগুণ সম্পর্কে পাঠ্য বই এ অন্তর্ভূক্তকরণ।
মধ্যমেয়াদী (২০৩২-২০৪৬)	❖ দুধ উৎপাদন ২০.৮৯ মিলিয়ন মে. টনে উন্নীতকরণ অর্থাৎ অভ্যন্তরীন চহিদা পূরণে স্বাবলম্বীতা ❖ উৎপাদিত দুধের ৫০ ভাগ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াজাতকরণ	• ২০৪৬ সাল নাগাদ বণিজ্যিক খামারের শতভাগ গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন। • দেশের ৫০ ভাগ দুগ্ধ খামার সম্পূর্ণ ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য ফ্যাসিলিটেট করা। • কৌলিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের জন্য ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তির ব্যবহার ২৫ ভাগ বৃদ্ধিকরণ। • দৈনিক গড়ে ১৫ লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সংকর জাতের গাভী উৎপাদন। • কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ৭৫ ভাগ মহিষের জাত উন্নয়ন। • Sexed Semen তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ। • মহিষের বণিজ্যিক খামার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ। • গরু/মহিষের ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তির ২০ ভাগ সম্প্রসারণ। • অধিক দুধ উৎপাদনশীল বাংলা ফ্রিজিয়ান জাতের উদ্ভাবন। • গাভীর অনুর্বরতা (ইনফার্টিলিটি) ৮০ ভাগ হ্রাসকরণ। • কৃমিনাশক সেবনের আওতাধীন গাভীর সংখ্যা শতভাগে উন্নীতকরণ। • ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন গবাদিপশুর সংখ্যা ৬০% বৃদ্ধিকরণ। • ম্যাসটাইটিস রোগজনিত ক্ষতি কমপক্ষে ৮০ ভাগ হ্রাসকরণ। • মাঠ পর্যায়ে সরকা রি ও সমাজভিত্তিক ভেটেরিনারি সেবা সম্প্রসারণ এবং ভেটেরিনারি কনসালটেন্সী ফার্মের মাধ্যমে গবাদিপশুর রোগ- ব্যাধি ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। • দুগ্ধ সংরক্ষণ ও বিপনণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। • আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার স্থাপন। • গুঁড়ো দুধ আমদানীর পরিমাণ ৮০ ভাগ হ্রাসকরণ। • দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫০ ভাগ বৃদ্ধির জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহন। • GIS (Geographic Information System) -এর মাধ্যমে দেশের অধিক দুধ উৎপাদনশীল এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করে কমপক্ষে ১০০ টি বিশেষায়িত ডেইরি হাব সৃষ্টিকরণ। • দেশের দুগ্ধজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

		• National Dairy Research Institute প্রতিষ্ঠা। • অর্গানিক ব্যবস্থাপনায় দুগ্ধ খামার পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ। • প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধ পণ্যের কমপক্ষে ২৫ ভাগ রপ্তানী করার ব্যবস্থা গ্রহণ। • সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় ৫০ ভাগ নতুন ভোক্তা সৃষ্টিকরণ।
দীর্ঘমেয়াদী (২০৪৭-২০৬৬)	❖ দুধ উৎপাদন ৩০.০৪ মিলিয়ন মে. টনে উন্নীতকরণ ❖ উৎপাদিত দুধের শতভাগ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াজাতকরণ	• ২০৬৬ সা লের মধ্যে শতভাগ বাণিজ্যিক খামারের মহিষকে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন। • দেশের শতভাগ দুগ্ধ খামার ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য ফ্যাসিলিটেট করা এবং প্রতিটি দুগ্ধ খামারকে সম্পূর্ণ মেকানাইজেশনের মাধ্যমে এক একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকরণ। • কৌলিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের জন্য ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তির পাশাপাশি ক্লোনিং এর প্রবর্তন। • দৈনিক গড়ে ২০ লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সংকর জাতের গাভী উৎপাদন। • গরু/মহিষের ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তির ৫০ ভাগ সম্প্রসারণ এবং ভ্রূণ ব্যাংক স্থাপন। • বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সিমেন ব্যাংক ও জীন ব্যাংক স্থাপন। • গাভীর পিউবার্টি (Puberty) পিরিয়ড সংকোচন। • গাভীর অনুর্বরতা (ইনফার্টিলিটি) শতভাগ হ্রাসকরণ। • কৃমিনাশক সেবনের আওতাধীন গাভীর সংখ্যা শতভাগে উন্নীতকরণ। • ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন গবাদিপশুর সংখ্যা শতভাগে উন্নীতকরণ। • ম্যাসটাইটিসসহ অন্যান্য রোগজনিত ক্ষতি কমপক্ষে ৮০ ভাগ হ্রাসকরণ। • মাঠ পর্যায়ে সরকা রি ও সমাজভিত্তিক ভেটেরিনারি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদিপশুর রোগ-ব্যাধি ৮০ ভাগ হ্রাসকরণ। • দুগ্ধ সংরক্ষণ ও বিপনণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। • আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার স্থাপন। • ভোক্তার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুঁড়ো দুধ আমদানীর পরিমাণ শতভাগ হ্রাসকরণ। • প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধ পণ্যের কমপক্ষে ৪০ ভাগ রপ্তানী করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.২ মেয়াদভিত্তিক মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশলগত পরিকল্পনা (সারণী-১১)

মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	কৌশল
স্বল্পমেয়াদী (২০১৭-২০৩১)	❖ মাংস উৎপাদন ৯.০২ মিলিয়ন মে. টনে উন্নীতকরণ অর্থাৎ অভ্যন্তরীন চহিদা পূরণে স্বাবলম্বীতা ❖ উৎপাদিত মাংসের ২৫ ভাগ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াজাতকরণ	• দেশের প্রতিটি বিভাগ ও জেলা শহরে আধুনিক মানের স্লটার হাউস স্থাপন ও খোলা স্থানে পশু জবাই কমপক্ষে ২০ ভাগ হ্রাসকরণ। • দেশের প্রতিটি উপজেলায় লাইভ বার্ড মার্কেট ও প্রতিটি জেলায় পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন। • ২০৩১ সাল নাগাদ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমের আওতাধীন গরুর সংখ্যা ৩০ লক্ষ হতে বাড়িয়ে ৫০ লক্ষে উন্নীতকরণ। • পোল্ট্রির সংখ্যা ৫০% বৃদ্ধিকরণ। • দেশের ৫০ ভাগ পোল্ট্রি খামার বাণিজ্যিক তথা ইনটেনসিভ খামারে রূপান্তরকরণ।

		• ব্রয়লার প্যারেন্ট স্টক ও গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপনের মাধ্যমে ডিওসি আমদানী ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। • কোরবানীর পশুর শতভাগ চাহিদা অভ্যন্তরীণ উৎস্য থেকে পূরণ। • বণিজ্যিক পদ্ধতিতে কোয়েল, টার্কি, উটপাখি, তিতির ইত্যাদি খামার স্থাপন ও সম্প্রসারণ। • অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাত উন্নয়নের জন্য বণিজ্যিক খামারসমূহে কমপক্ষে ২৫ ভাগ গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন। • গড়ে ৫০০ কেজি দৈহিক ওজন সমৃদ্ধ সংকর ষাঁড় উৎপাদন। • অঞ্চল-ভিত্তিক বিশেষত: দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় এবং হাওড়এলাকাসমূহে মহিষের সংখ্যাগত উৎপাদন বৃদ্ধি। • কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ৪০ ভাগ মহিষের জাত উন্নয়ন। • প্রতিটি জেলায় ১টি করে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন। • শতভাগ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কৃত্রিম প্রজননের ডাটা সংরক্ষণ। • GIS (Geographic Information System) এর মাধ্যমে দেশের অধিক মাংস উৎপাদনশীল এলাকাসমূহকে চিহ্নিতকরণ ও বিশেষায়িত মাংস উৎপাদন অঞ্চল ঘোষণা। • ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থার ৫০ ভাগ উন্নয়ন। • চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পোল্ট্রিতে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। • পশুরোগ সম্পর্কিত নিয়মিত সার্ভিল্যান্সের ব্যবস্থা গ্রহণ। • দেশের ৩০ ভাগ জেলা এফএমডি (ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ) ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা। • এ্যানথ্রাক্সসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগজনিত ক্ষতি কমপক্ষে ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। • কৃমিনাশক সেবনের আওতাধীন গাভীর সংখ্যা ৫০% বৃদ্ধিকরণ। • ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন গবাদিপশুর সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধিকরণ। • সরকারী গবেষনাগারসমূহে ভ্যাক্সিন উৎপাদ ন বৃদ্ধি, ভ্যাক্সিনের মান নিয়ন্ত্রণ, সুনির্দিষ্ট রোগের বিরূদ্ধে নিবিড়/কৌশলগত টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন। • বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত ভ্যাক্সিন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও উদ্বুধকরণ। • মাঠ পর্যায়ে সরকা রি ও সমাজভিত্তিক ভেটেরিনারি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদিপশুর রোগ-ব্যাধি ২৫ ভাগ হ্রাসকরণ। • মাংস সংরক্ষণ ও বিপনণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। • দেশের মাংসজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। • প্রাণিরোগ নির্ণয় গবেষণাগারের আধুনিকায়ন ও এক্রেডিটেশন। • অপ্রচলিত উৎস থেকে পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। • প্রক্রিয়াজাত মাংসজাত পণ্যের কমপক্ষে ১৫ ভাগ রপ্তানী করার ব্যবস্থা গ্রহণ। • অধিক মেটাবোলিজম ক্ষমতাসম্পন্ন পুষ্টিকর গো-খাদ্যের গবেষণা জোরদারকরণ। • রপ্তানীমুখী শিল্প সম্প্রসারণ এবং মাংসজাত পন্য রপ্তানী বিষয়ক নীতিমালার বাস্তবায়ন। • দেশে প্রাণি উৎস থেকে প্রাপ্ত উপজাতসমূহের রপ্তানী শতভাগ বৃদ্ধিকরণ। • মাংসজাত পণ্যের গুনাগুণ সম্পর্কে পাঠ্য বই এ অন্তর্ভূক্তকরণ।

মধ্যমেয়াদী (২০৩২-২০৪৬)	❖ মাংস উৎপাদন ১২.১০ মিলিয়ন মে. টনে উন্নীতকরণ ❖ উৎপাদিত মাংসের ৬০ ভাগ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াজাতকরণ	● দেশের প্রতিটি উপজেলায় আধুনিক মানের যুগোপযোগী স্লটার হাউস স্থাপন ও খোলা স্থানে পশু জবাই কমপক্ষে ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● দেশের প্রতিটি উপজেলার স্থানীয় বাজারসমূহে লাইভ বার্ড মার্কেট ও প্রতিটি উপজেলায় পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন। ● ২০৪৬ সাল নাগাদ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমের আওতাধীন গরুর সংখ্যা ৩০ লক্ষ হতে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষে উন্নীতকরণ। ● পোল্ট্রির সংখ্যা ১০০% বৃদ্ধিকরণ। ● দেশের শতভাগ পোল্ট্রি খামার বাণিজ্যিক তথা ইনটেনসিভ খামারে রূপান্তরকরণ। ● ব্রয়লার প্যারেন্ট স্টক ও গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপনের মাধ্যমে ডিওসি আমদানী শতভাগ হ্রাসকরণ। ● সিলেকশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের জাত উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক খামারের সম্প্রসারণ। ● অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাত উন্নয়নের জন্য বণিজ্যিক খামারসমূহে কমপক্ষে ৫০ ভাগ গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন। ● গড়ে ৮০০ কেজি দৈহিক ওজন সমৃদ্ধ সংকর ষাঁড় উৎপাদন। ● অধিক উৎপাদনশীল ডাবল মাসলড বাংলা ব্রাহমা জাতের উদ্ভাবন। ● কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ৮০ ভাগ মহিষের জাত উন্নয়ন। ● Sexed Semen তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ। ● শতভাগ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মাংস ও মাংসজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ। ● GIS (Geographic Information System) এর মাধ্যমে দেশের অধিক মাংস উৎপাদনশীল এলাকাসমূহকে চিহ্নিতকরণ ও বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ। ● ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থার শতভাগ উন্নয়ন। ● দেশের সকল জেলা এফএমডি (ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ) ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা। ● এ্যানথ্রাক্সসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগজনিত ক্ষতি কমপক্ষে ৮০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● কৃমিনাশক সেবনের আওতাধীন গাভীর সংখ্যা শতভাগ বৃদ্ধিকরণ। ● মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে বিফ ফ্যাটেনিং খামার স্থাপন ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ। ● ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন গবাদিপশুর সংখ্যা ৬০% বৃদ্ধিকরণ। ● চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে Livestock এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার শতভাগ হ্রাসকরণ। ● মাঠ পর্যায়ে সরকা রি ও সমাজভিত্তিক ভেটেরিনারি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদিপশুর রোগ-ব্যাধি ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● প্যাকেটজাত মাংস ও মাংস জাত বিবিধ পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে ৫০ ভাগ অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন ও বিপনণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ● দেশের মাংসজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার শতভাগ উন্নয়ন। ● প্রাণিরোগ নির্ণয় গবেষণাগারের আধুনিকায়ন ও এক্রেডিটেশন। ● অপ্রচলিত উৎস থেকে পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। ● প্রক্রিয়াজাত মাংসজাত পণ্যের কমপক্ষে ২৫ ভাগ রপ্তানী করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

		● দেশে প্রাণি উৎস থেকে প্রাপ্ত উপজাতসমূহের রপ্তানী ৫০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ। ● অর্গানিক ব্যবস্থাপনায় বিফ ফ্যাটেনিং খামার পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ।
দীর্ঘমেয়াদী (২০৪৭-২০৬৬)	❖ মাংস উৎপাদন ১৬.২১ মিলিয়ন মে. টনে উন্নীতকরণ ❖ উৎপাদিত মাংসের শতভাগ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াজাতকরণ	● দেশের প্রতিটি উপজেলায় প্রয়োজন অনুযায়ী আধুনিক মানের যুগোপযোগী স্লটার হাউস স্থাপন ও খোলা স্থানে পশু জবাই শতভাগ নিয়ন্ত্রণ। ● ২০৬৬ সাল নাগাদ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমের আওতাধীন গরুর সংখ্যা ৩০ লক্ষ হতে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষে উন্নীতকরণ। ● পোল্ট্রির সংখ্যা ১০০% বৃদ্ধিকরণ। ● দেশের শতভাগ পোল্ট্রি খামার বাণিজ্যিক তথা ইনটেনসিভ খামারে রূপান্তরকরণ। ● অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাত উন্নয়নের জন্য বণিজ্যিক খামারসমূহে কমপক্ষে শতভাগ গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন। ● গড়ে ১২০০ কেজি দৈহিক ওজন সমৃদ্ধ সংকর ষাঁড় উৎপাদন। ● শতভাগ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মাংস ও মাংসজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ। ● মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে বিফ ফ্যাটেনিং খামার স্থাপন ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও হালাল মাংস রপ্তানী। ● ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন গবাদিপশুর সংখ্যা শতভাগ বৃদ্ধিকরণ। ● মাঠ পর্যায়ে সরকা রি ও সমাজভিত্তিক ভেটেরিনারি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদিপশুর রোগ-ব্যাধি ৮০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● প্যাকেটজাত মাংস ও মাংস জাত বিবিধ পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে শতভাগ অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন ও সুনির্দিষ্ট বিপনণ কাঠামো গঠন। ● প্রক্রিয়াজাত মাংসজাত পণ্যের কমপক্ষে ৫০ ভাগ রপ্তানী করার ব্যবস্থা গ্রহণ। ● দেশে প্রাণি উৎস থেকে প্রাপ্ত উপজাতসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণ ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন ও ভ্যালু এডেড পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধিকরণ।

৯.৩ মেয়াদভিত্তিক ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশলগত পরিকল্পনা (সারণী-১২)

মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	কৌশল
স্বল্পমেয়াদী (২০১৭-২০৩১)	❖ ডিম উৎপাদন ২১৭৮০.৩৩ মিলিয়নে উন্নীতকরণ ❖ পোল্ট্রি শিল্পে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ৩০ লক্ষ থেকে ৪৫ লক্ষে উন্নীতকরণ	● ২০৩১ সাল নাগাদ দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৬০ টি হতে ৮০ টি তে বাড়ানো। ● বাণিজ্যিক জাতের লেয়ার মুরগির ডিম উৎপাদন বছরে ২২০ টি হতে ২৮০ টিতে বাড়ানো। ● হাঁসের জাত উন্নয়নে র মাধ্যমে ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৭৭ টি হতে ৯০ টি তে বাড়ানো। ● দেশের প্রতিটি বিভাগ ও অঞ্চলভিত্তিক জেলা শহরে এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোলড হাউস সমৃদ্ধ আধুনিক মানের বাণিজ্যিক লেয়ার প্যারেন্ট সটক ও গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপন। ● ডিমপাড়া মুরগির সংখ্যা ৭৩১.৩৭ লক্ষ থেকে ১০৯৭.০৬ লক্ষে বৃদ্ধিকরণ। ● ডিমপাড়া হাঁসীর সংখ্যা ১৩০.১৮ লক্ষ থেকে ১৯৫.২৭ লক্ষে বৃদ্ধিকরণ। ● দেশের ৫০ ভাগ মাঝারি আকারের লেয়ার খামার বাণিজ্যিক তথা ইনটেনসিভ খামারে রূপান্তরকরণ। ● লেয়ার প্যারেন্ট স্টক ও গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপনের মাধ্যমে ডিওসি আমদানী ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার শতভাগ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পূরণ। ● দেশীয় আবহাওহায় উপযোগী ও অধিক উৎপাদনশীল লেয়ারের স্ট্রেইন উদ্ভাবন। ● বণিজ্যিক পদ্ধতিতে কোয়েল, টার্কি, উটপাখি, তিতির ইত্যাদি খামার স্থাপন ও সম্প্রসারণ। ● প্রতিটি জেলায় সরকারিভাবে ১টি করে পোল্ট্রি হ্যাচারী স্থাপন। ● স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পোলিট্র খামারের ডাটা সংরক্ষণ। ● GIS (Geographic Information System) এর মাধ্যমে দেশের ডিম উৎপাদনশীল এলাকাসমূহকে চিহ্নিতকরণ ও বিশেষায়িত পোল্ট্রি শিল্প অঞ্চল ঘোষণা। ● এগ বর্ণ ডিজিজ ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● পোল্ট্রির রোগজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় ভেটেরিনারি সেবার পরিধি ৫০ ভাগ বৃদ্ধিকরণ। ● পোল্ট্রি ফিডে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও ভেজাল হ্রাসকরণ। ● চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পোল্ট্রিতে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● পোল্ট্রির রোগ সম্পর্কিত নিয়মিত সার্ভিল্যান্সের ব্যবস্থা গ্রহণ। ● ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন পোল্ট্রির সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধিকরণ। ● সরকারি গবেষণাগারসমূহে ভ্যাক্সিন উৎপাদন বৃদ্ধি, ভ্যাক্সিনের মান নিয়ন্ত্রণ, সুনির্দিষ্ট রোগের বিরূদ্ধে নিবিড়/কৌশলগত টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

		● বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত ভ্যাক্সিন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও উদ্বুধকরণ। ● পোল্ট্রি ভ্যাক্সিন আমদানী ৩০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● ডিম সংরক্ষণ ও বিপনণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ● অপ্রচলিত উৎস থেকে পোল্ট্রি খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। ● ডিম থেকে প্রক্রিয়াজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শতভাগ অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন ও রপ্তানী করার ব্যবস্থা গ্রহণ। ● অধিক মেটাবোলিজম ক্ষমতাসম্পন্ন পুষ্টিকর পোল্ট্রি-খাদ্যের গবেষণা জোরদারকরণ। ● রপ্তানীমুখী শিল্প সম্প্রসারণ এবং পন্য রপ্তানী বিষয়ক নীতিমালার বাস্তবায়ন। ● অর্গানিক ব্যবস্থাপনায় লেয়ার খামারের সম্প্রসারণ। ● ডিমের গুনাগুণ সম্পর্কে পাঠ্য বইতে অন্তর্ভূক্তকরণ।
মধ্যমেয়াদী (২০৩২-২০৪৬)	❖ ডিম উৎপাদন ২৭৭২৮.৩৩ মিলিয়নে উন্নীতকরণ ❖ পোল্ট্রি শিল্পে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ৩০ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষে বৃদ্ধিকরণ	● ২০৪৬ সাল নাগাদ দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১০০ টি তে উন্নীতকরণ। ● বাণিজ্যিক জাতের লেয়ার মুরগির ডিম উৎপাদন বছরে ৩০০ টি তে উন্নীতকরণ। ● হাঁসের জাত উন্নয়নে মাধ্যমে ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১৪০ টি তে উন্নীতকরণ। ● দেশের প্রতিটি জেলা শহরে এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোলড হাউস সমৃদ্ধ আধুনিক মানের বাণিজ্যিক লেয়ার প্যারেন্ট স্টক ও গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপন। ● ডিমপাড়া মুরগির সংখ্যা ৭৩১.৩৭ লক্ষ থেকে ১৬৪৫.৫৯ লক্ষে বৃদ্ধিকরণ। ● ডিমপাড়া হাঁসীর সংখ্যা ১৩০.১৮ লক্ষ থেকে ২৪৪.০৯ লক্ষে বৃদ্ধিকরণ। ● দেশের ৮০ ভাগ মাঝারি আকারের লেয়ার খামার বাণিজ্যিক তথা ইনটেনসিভ খামারে রূপান্তরকরণ। ● পোল্ট্রির সংখ্যা ২০০% বৃদ্ধিকরণ। ● লেয়ার প্যারেন্ট স্টক ও গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপনের মাধ্যমে ডিওসি আমদানী শতভাগ হ্রাসকরণ। ● মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে পোল্ট্রি খামার স্থাপন ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ। ● ডিম থেকে উৎপাদিত প্যাকেটজাত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে ২০০% অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন ও বিপনণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ● বণিজ্যিক পদ্ধতিতে কোয়েল, টার্কি, উটপাখি, তিতির ইত্যাদি খামার স্থাপন এবং রপ্তানী শিল্পের সম্প্রসারণ। ● শতভাগ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পোল্ট্রি খামারের ডাটা সংরক্ষণ। ● পোল্ট্রির রোগজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় ভেটেরিনারি সেবার পরিধি শতভাগ বৃদ্ধিকরণ। ● এগ বর্ণ ডিজিজ শতভাগ হ্রাসকরণ। ● পোল্ট্রি ড্রাগস আমদানী শতভাগ হ্রাসকরণ। ● পোল্ট্রি ফিডে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও ভেজাল নিয়ন্ত্রণ। ● চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পোল্ট্রিতে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার শতভাগ হ্রাসকরণ।

		● পোল্ট্রির রোগ সম্পর্কিত নিয়মিত সার্ভিল্যান্সের ব্যবস্থা গ্রহণ। ● ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন পোল্ট্রির সংখ্যা ৬০% বৃদ্ধিকরণ। ● পোল্ট্রি ভ্যাক্সিন আমদানী ৬০ ভাগ হ্রাসকরণ। ● ডিম সংরক্ষণাগার নির্মাণ ও সুনির্দিষ্ট বিপনণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ● Waste Materials রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে পোল্ট্রি খাদ্যের যোগান বৃদ্ধিকরণ।
দীর্ঘমেয়াদী (২০৪৭-২০৬৬)	❖ ডিম উৎপাদন ৩৫৬৫৯.০০ মিলিয়নে উন্নীতকরণ ❖ পোল্ট্রি শিল্পে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ৩০ লক্ষ থেকে ৯০ লক্ষে বৃদ্ধিকরণ	● ২০৬৬ সাল নাগাদ দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১৫০ টি তে উন্নীতকরণ। ● বাণিজ্যিক জাতের লেয়ার মুরগির ডিম উৎপাদন বছরে ৩২০ টি তে উন্নীতকরণ। ● হাঁসের জাত উন্নয়নে মাধ্যমে ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ২০০ টি তে উন্নীতকরণ। ● ডিমপাড়া মুরগির সংখ্যা ৭৩১.৩৭ লক্ষ থেকে ২৩৪০.৩৮ লক্ষে বৃদ্ধিকরণ। ● ডিমপাড়া হাঁসীর সংখ্যা ১৩০.১৮ লক্ষ থেকে ২৬০.৩৬ লক্ষে বৃদ্ধিকরণ। ● দেশের শতভাগ মাঝারি আকারের লেয়ার খামার বাণিজ্যিক তথা ইনটেনসিভ খামারে রূপান্তরকরণ। ● পোল্ট্রির সংখ্যা ৩২৫% বৃদ্ধিকরণ। ● অন্তর্জাতিক মানের লেয়ার প্যারেন্ট স্টক ও গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক ইনডাস্ট্রি স্থাপনের মাধ্যমে ডিওসি রপ্তানী। ● ডিম থেকে উৎপাদিত প্যাকেটজাত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে ৩০০% অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন ও বিপনণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ● বণিজ্যিক পদ্ধতিতে কোয়েল, টার্কি, উটপাখি, তিতির ইত্যাদি খামার স্থাপন এবং রপ্তানী শিল্পের সম্প্রসারণ। ● এগ বর্ণ ডিজিজ শতভাগ হ্রাসকরণ। ● পোল্ট্রির রোগ সম্পর্কিত নিয়মিত সার্ভিল্যান্সের ব্যবস্থা গ্রহণ। ● ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন পোল্ট্রির সংখ্যা শতভাগ বৃদ্ধিকরণ। ● পোল্ট্রি ভ্যাক্সিন আমদানী শতভাগ হ্রাসকরণ। ● পোল্ট্রি ড্রাগস রপ্তানীর ব্যবস্থা গ্রহণ। ● National Poultry Research Institute প্রতিষ্ঠা। ● দেশে লেয়ার খামার থেকে প্রাপ্ত উপজাতসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণ ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন ও ভ্যালু এডেড পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধিকরণ।

৯.৪ মেয়াদভিত্তিক প্রাণি উৎসের রোগ প্রতিরোধ এবং দমনেরকৌশল (সারণী-১৩)

মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	কৌশল
স্বল্পমেয়াদী (২০১৭-২০৩১)	❖ প্রাণি রোগ জনিত ক্ষতি ৩০ ভাগ হ্রাসকরণ ❖ প্রাণি উৎস থেকে রোগ সংক্রমণ ৩০ ভাগ হ্রাসকরণ	● জুনোটিক রোগের হার ৩০% এ কমিয়ে আনা। ● মাংস বাহিত রোগের হার ৩০% এ কমিয়ে আনা। ● দুগ্ধ বাহিত রোগের হার ৩০% এ কমিয়ে আনা। ● ডিম বাহিত রোগের হার ৩০% এ কমিয়ে আনা। ● রিপ্রোডাক্টিভ রোগের হার ৫০% এ কমিয়ে আনা।

		• জুনোটিক রোগ সার্ভিলেন্স এর জন্য ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরীর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। • স্যালমোনেলা রোগ দমনের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণসহ দক্ষ জনবল গড়ে তোলা। • কোয়ারেন্টাইন সার্ভিলেন্স তৈরি। • ভেটেরিনারি ইপিডেমিওলোজি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা। • ভেটেরিনারি সেবার পরিধি ৫০ ভাগ বৃদ্ধিকরণ এবং বেসরকারি পর্যায়ে ভেটেরিনারি ফার্ম প্রতিষ্ঠা। • দেশের প্রতিটি বিভাগ ও জেলা শহরে আধুনিক মানের স্লটার হাউস স্থাপন ও খোলা স্থানে পশু জবাই কমপক্ষে ২০ ভাগ হ্রাসকরণ। • বাংলাদেশের পশু জবাই ও মাংস নিয়ন্ত্রণ আইন এবং পশুরোগ বিধিমালার বাস্তবায়ন ৩০ ভাগ সম্প্রসারণ। • আধুনিক কসাইখানা গড়ে তুলতে ব্যক্তি খাতকে সহায়তাকরণ ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি। • মাংস পরিদর্শকদের সক্ষমতা তৈরি এবং মাংস উৎপাদনের সাথে HACCP মেনে চলা। • দেশের প্রতিটি জেলায় লাইভ বার্ড মার্কেট ও প্রতিটি জেলায় পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন। • নতুন আভির্ভাবযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ। • মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক পরিসেবা চালুকরণ। • প্রাণি রোগ নির্ণয় গবেষণাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধি। • ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থার ৫০ ভাগ উন্নয়ন। • চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে গবাদিপশু ও পোল্ট্রিতে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। • দেশের ৩০ ভাগ জেলা এফএমডি (ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ) ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা। • দেশকে পিপিআর রোগমুক্ত ঘোষণা। • কৃমিনাশক সেবনের আওতাধীন গাভীর সংখ্যা ৫০% বৃদ্ধিকরণ। • ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন গবাদিপশুর সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধিকরণ। • রোগ দমনে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ গড়ে তোলা। • Comprehensive Livestock Disease Control নীতিমালা প্রণয়ন। • সেনেটারী ডিম উৎপাদন ও বাজারজাত সংক্রান্ত নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। • সরকারী গবেষনাগারসমূহে ভ্যাক্সিন উৎপাদ ন বৃদ্ধি, ভ্যাক্সিনের মান নিয়ন্ত্রণ, সুনির্দিষ্ট রোগের বিরূদ্ধে নিবিড়/কৌশলগত টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন। • বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত ভ্যাক্সিন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও উব্বুধকরণ।
মধ্যমেয়াদী (২০৩২-২০৪৬)	❖ প্রাণি রোগ জনিত ক্ষতি ৬০ ভাগ হ্রাসকরণ ❖ প্রাণি উৎস থেকে রোগ সংক্রমণ ৬০ ভাগ হ্রাসকরণ	• জুনোটিক রোগের হার ৬০% এ কমিয়ে আনা। • মাংস বাহিত রোগের হার ৬০% এ কমিয়ে আনা। • দুগ্ধ বাহিত রোগের হার ৬০% এ কমিয়ে আনা। • ডিম বাহিত রোগের হার ৬০% এ কমিয়ে আনা। • রিপ্রোডাক্টিভ রোগের হার ৮০% এ কমিয়ে আনা।

		• জুনোটিক রোগ সার্ভিলেন্স এর জন্য অঞ্চল ভিত্তিক ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরী স্থাপন। • সারাদেশে বেসরকারিভাবে ভেটেরিনারি ক্লিনিক স্থাপন ও সম্প্রসারণ। • টেলিমেডিসিন সেবা পদ্ধতির সম্প্রসারন। • ভেটেরিনারি সেবার পরিধি ৮০ ভাগ বৃদ্ধিকরণ এবং বেসরকারি পর্যায়ে ভেটেরিনারি পরামর্শ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। • দেশের প্রতিটি উপজেলা শহরে আধুনিক মানের স্লটার হাউস স্থাপন ও খোলা স্থানে পশু জবাই কমপক্ষে ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ। • বাংলাদেশের পশু জবাই ও মাংস নিয়ন্ত্রণ আইন এবং পশুরোগ বিধিমালার বাস্তবায়ন ৬০ ভাগ সম্প্রসারণ। • দেশের প্রতিটি উপজেলায় লাইভ বার্ড মার্কেট ও পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন। • নতুন আভির্ভাবযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ। • ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থার শতভাগ উন্নয়ন। • চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে গবাদিপশু ও পোল্ট্রিতে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার শতভাগ হ্রাসকরণ। • দেশের ৬০ ভাগ জেলা এফএমডি (ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ) ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা। • কৃমিনাশক সেবনের আওতাধীন গবাদিপশুর সংখ্যা শতভাগ বৃদ্ধিকরণ। • ভ্যাক্সিনেশনের আওতাধীন গবাদিপশুর সংখ্যা ৬০% বৃদ্ধিকরণ। • ONE Health Services এর জন্য নতুন উইং গঠন। • কমিউনিকেবল ডিজিজ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভ্যাক্সিন ও ভেটেরিনারি ড্রাগস বিষয়ক গবেষ ণা জোরদারকরণ। • অন্ত: ও বহি : পরজীবী, প্রোটোজোয়া, ফাংগাই, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের ডিএনএ/আরএনএ এর নিওক্লিওটাইড সিকোয়েন্সিং এবং নিওক্লিওটাইড (টেমপ্লেট) ব্যাংক স্থাপন। • National Animal Drugs Regulatory Authority প্রতিষ্ঠা। • Pet Animal Health বিষয়ক পলিসি প্রণয়ন।
দীর্ঘমেয়াদী (২০৪৭-২০৬৬)	❖ প্রাণি রোগ জনিত ক্ষতি ৬০ ভাগ হ্রাসকরণ ❖ প্রাণি উৎস থেকে রোগ সংক্রমণ ৬০ ভাগ হ্রাসকরণ	• জুনোটিক রোগের হার ৮০% এ কমিয়ে আনা। • মাংস বাহিত রোগের হার ৮০% এ কমিয়ে আনা। • দুগ্ধ বাহিত রোগের হার ৮০% এ কমিয়ে আনা। • ডিম বাহিত রোগের হার ৮০% এ কমিয়ে আনা। • রিপ্রোডাক্টিভ রোগের হার শতভাগ নিয়ন্ত্রণ। • সারাদেশে বেসরকারিভাবে ভেটেরিনারি ক্লিনিক স্থাপন ও সম্প্রসারণ। • বৈশ্বিক টেলিমেডিসিন সেবা পদ্ধতির সম্প্রসারন। • ভেটেরিনারি সেবার পরিধি শতভাগ বৃদ্ধিকরণ এবং বেসরকারি পর্যায়ে ভেটেরিনারি পরামর্শ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। • দেশের প্রতিটি বাজারে স্লটার হাউস স্থাপন ও খোলা স্থানে পশু জবাই শতভাগ হ্রাসকরণ। • বাংলাদেশের পশু জবাই ও মাংস নিয়ন্ত্রণ আইন এবং পশুরোগ বিধিমালার বাস্তবায়ন

		শতভাগ সম্প্রসারণ। • দেশের প্রতিটি বাজারে লাইভ বার্ড মার্কেট ও পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন। • নতুন আভির্ভাবযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ। • চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে গবাদিপশু ও পোল্ট্রিতে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার ও এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিসটেন্স শতভাগ নিয়ন্ত্রণ। • দেশকে এফএমডি (ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ) রোগমুক্ত ঘোষণা। • শতভাগ গবাদিপশুকে ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় আনয়ন। • কমিউনিকেবল ডিজিজ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভ্যাক্সিন ও ভেটেরিনারি ড্রাগস বিষয়ক গবেষণা জোরদারকরণ। • Vaccine seed development centre প্রতিষ্ঠা। • National Pet Animal Research Institute প্রতিষ্ঠা। • National Laboratory Animal Research Institute প্রতিষ্ঠা।

৯.৫ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইনী কাঠামোর সংস্কার ও উন্নয়নকৌশল (সারণী-১৪)

পর্যায়	কৌশল
স্বল্পমেয়াদী (২০১৭-২০৩১)	• Revision of Breeding Policy-1982 • Revision of National Livestock Development Policy-2007 • Revision of Poultry Development Policy-2008 • Formulation of Livestock Extension Policy • Formulation of Livestock Extension Manual • Formulation of Dairy Development Policy • Formulation of Sheep and Goat Development Policy • Establishment of National Veterinary Epidemiology Institute • Introducing livestock Insurance Policy • Introducing Animal Breeing Act • Livestock Products & By-products Export Policy • Comprehensive Livestock Disease Control Policy • Policy formulation for sanitary and phytosanitary concerning livestock and poultry practices • Policy formulation for Safe Food of Livestock Origin • Development of Policy Guidelines for Good Manufacturing Process (GMP) of livestock products • Formulation of Waste Management and Wet Market Phase Out Policy • Policy Formulation towards domestic technology development program • Formulation of Livestock policies on Sustainable Consumption and Production (SCP) of livestock Products • Formulation of Policy Guidelines for Reducing Post Harvest loss in SCP of

	Livestock • Formulation of Guidelines for deveopment of a sustainable database • Introducing Semen import and export act • Policy for Pet Animal Health • Formulation of animal breeding record keeping policy • Establishment of National Dairy Development Board • Establishment of Sheep and Goat Development Board • Establishment of National Poultry Development Board • Establishment of Hatchery & Animal Feeds Regulatory Council • Formulation of National Avian Influenza Preparedness plan • Accreditation of Animal Nutrition Laboratory • Diseases Control Compensation Policy • State Veterinary Service Policy • Revision of Animal Welfare Act, 2017
মধ্যমেয়াদী (২০৩২-২০৪৬)	• Accreditation of Central Disease Investigation Laboratory • Establishment of new wing for ONE Health services • Establishment of National Veterinary Drugs Regulatory Authority • Animal Genetic Resource Conservation Policy • Creation of seperate Department for Livestock Marketing • Policy Formulation on promotion of hygienic activities in livestock practices • Establishment of National Dairy Research Institute • Policy guidelines on outlines and expedite research on vaccine and medicine in livestock sector for communicable disease • Introducing Zoo Act • Gene Bank Establishment Policy • Formulation of National Animal Health Disaster Committee
দীর্ঘমেয়াদী (২০৪৭-২০৬৬)	• Establishment of Semen, Embryo & Nucleotide Bank • Establishment of vaccine seed development centre • Establishment of National Poultry Research Institute • Establishment of National Pet Animal Research Institute • Establishment of National Laboratory Animal Research Institute • Establishment of National Nutrition Research Institute

১০. প্রস্তাবিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্তরায়

প্রাণিসম্পদ খাতে ৫০ বছরের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্প , মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার যে প্রস্তাব করা হয়েছে, আপতদৃষ্টিতে তা বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা হলো প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব (যা ৭.১০ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন অংশে বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং তা উত্তরণের দিক নির্দেশনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে) এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বা অর্থের অপ্রতুলতা। যদিও একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে প্রস্তাবিত কমপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে সর্ব মোট প্রাক্কলিত ব্যয় কত হবে তা এ পর্যায়ে নির্ণয় করা অত্যন্ত দূরহ। তবে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রতিবছর অধিদপ্তরের সর্বমোট বাজেট (রাজস্ব এবং উন্নয়ন) বৃদ্ধি পাচ্ছে (লেখচিত্র-১৮), তবে এ বৃদ্ধির মাত্রা কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করেনি। অর্থাৎ বছর ভিত্তিক রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধির শতকরা হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা হ্রাস্ব পেয়েছে (লেখচিত্র-১৯)। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে এ মহা পরি কল্পনার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বাজেট বর্তমান প্রাপ্তির তুলনায় কয়েকগুন বৃদ্ধি করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে বর্তমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শুধুমাত্র কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতাদি বাবদ বার্ষিক নুন্যতম খরচ হয় প্রায় ৩২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন পর্যায়ে এ খাতে মোট বার্ষিক ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় ৮৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা।

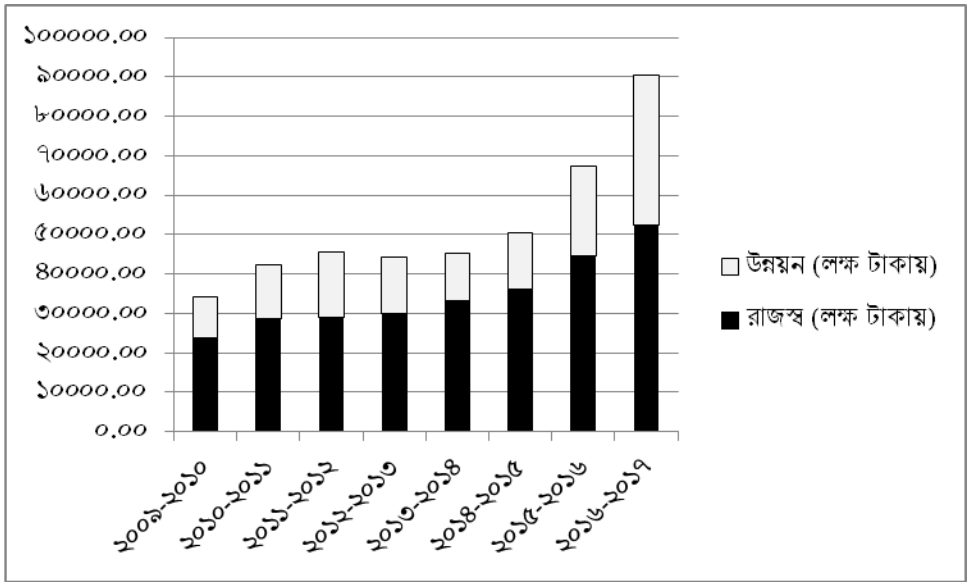

লেখচিত্র-১৮: ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটখাতে মোট বরাদ্ধ।

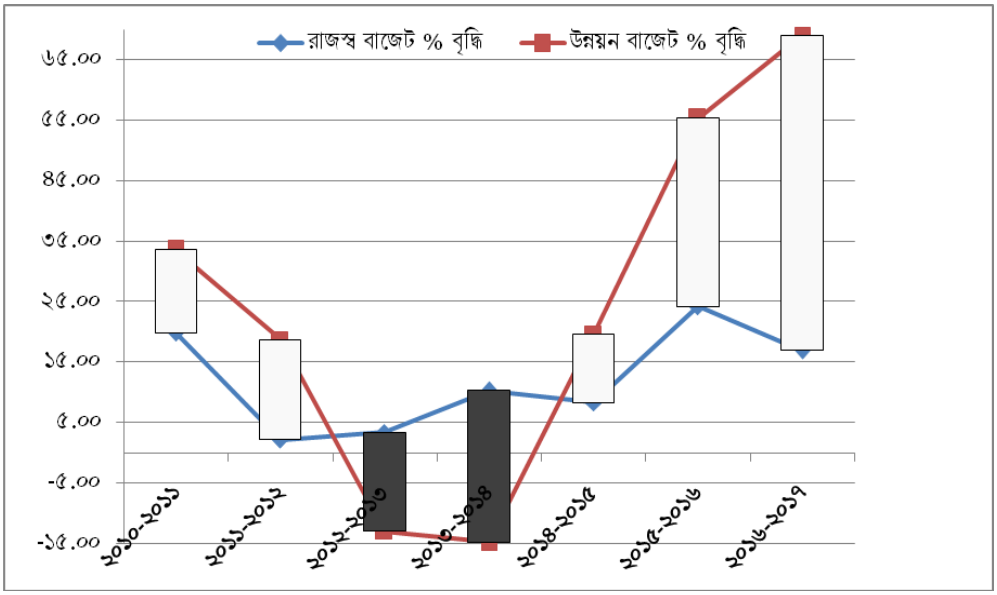

লেখচিত্র-১৯: ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেট প্রাপ্তির শতকরা হার।

এছাড়াও প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদী কৌশলগত সম্ভাব্য অর্জনে নিম্নলিখিত বাধা/সমস্যা হতে পারে:

- জমির প্রাপ্যতার অভাবে কর্ম পরিকল্পনায় বাস্তবায়নাধীন অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাধার সম্মূখীন হতে পারে।
- প্রকৃত তথ্যের ঘাটতি
- মূল্যস্ফীতি কর্মপরিকল্পনা ব্যয় বৃদ্ধির কারন হতে পারে
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ঠ অঙ্গ সমুহের সমন্বয়ের ঘাটতি বা সমন্বিত উদ্যেগের অভাব
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের অভিজ্ঞতা,দক্ষতা এবং উদ্যোগের ঘাটতি
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- রাজনৈতিক অস্থিরতা
- সময়মত জনবল নিয়োগ ও ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া
- সুবিধাভোগী গ্রুপের একটি দল হিসাবে কাজ করার ইচ্ছা
- চাহিদানুযায়ী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আইটেমসমূহ সংযো জন বা বিয়োজনের ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয় এবং সময় বৃদ্ধি পেতে পারে
- প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের অভাব। যেমন প্রাণিসম্পদের বিদ্যমান জনবল দিয়ে যে সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে উপকৃত খামারী /কৃষকদের কি পরিমান আর্থিক লাভবান হচ্ছেন , এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থাকলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হতো।
- এছাড়াও গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় Economical Impact Analysis সংক্রান্ত তত্য উপাত্তের অভাব। কারণ এ সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী রোগের গুরুত্ব অনুসারে কার্যক্রম গ্রহনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহন সহজতর হয়।

১১ উপসংহার:

প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, ব্যাংক, আর্থিক এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহন জরুরী। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন Stakeholders যথা: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডেইরী, পোল্ট্রি খামারী, ঔষধ কোম্পানি, গবেষকসহ এ খাতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত মত বিনিময়ের আলোকে তাদের মতামত, চাহিদা ও পরামর্শ মহাপরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করা যেতে পারে এবং তদপ্রেক্ষিতে চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রস্তাব করা যেতে পারে।

সারণি-১৫: কৌশল ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের তালিকা (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত ও মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সাম্ভাব্য প্রকল্পসমূহ)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম
১।	নির্বাচিত উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ও মিনি ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল ভেটেরিনারি সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প।
২।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প।
৩।	কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারী হাসপাতাল আধুনিকায়ন প্রকল্প।
৪।	কেন্দ্রীয় প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।
৫।	আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারসমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।
৬।	ছাগল ও ভেড়া উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প।
৭।	স্মার্ট-ই প্রাণিসম্পদ সেবা প্রকল্প।
৮।	পার্বত্য জেলাসমূহে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।
৯।	উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।
১০।	হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।
১১।	সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।
১২।	প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি।
১৩।	আধুনিক প্রযুক্তিতে গরুহৃষ্টপুষ্ট করণ প্রকল্প।
১৪।	লাইভস্টক ইমার্জিং এন্ড রি-ইমার্জিং ডিজিজ কন্ট্রোল প্রকল্প (ফেজ-১)।
১৫।	লাইভস্টক ইমার্জিং এন্ড রি-ইমার্জিং ডিজিজ কন্ট্রোল প্রকল্প (ফেজ-২)।
১৬।	লাইভস্টক ইমার্জিং এন্ড রি-ইমার্জিং ডিজিজ কন্ট্রোল প্রকল্প (ফেজ-৩)।
১৭।	বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।
১৮।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।
১৮।	নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সেবা জোরদারকরণ প্রকল্প (ফেজ-১)।
১৯।	নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সেবা জোরদারকরণ প্রকল্প (ফেজ-২)।
২০।	নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সেবা জোরদারকরণ প্রকল্প (ফেজ-৩)।
২১।	দেশব্যাপী পিপিআর রোগ নির্মূল এবং কৌশলগত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-১)।
২২।	দেশব্যাপী পিপিআর রোগ নির্মূল এবং কৌশলগত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-২)।
২৩।	দেশব্যাপী পিপিআর রোগ নির্মূল এবং কৌশলগত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-৩)।
২৪।	স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে বাছুর ও বকনা পালন শীর্ষক প্রকল্প (ফেজ-১)।
২৫।	স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে বাছুর ও বকনা পালন শীর্ষক প্রকল্প (ফেজ-২)।
২৬।	স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে বাছুর ও বকনা পালন শীর্ষক প্রকল্প (ফেজ-৩)।
২৭।	জাতীয় গবাদিপশু প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন ও ডেইরী উন্নয়ন খামার আধুনিকায়ন প্রকল্প।
২৮।	প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান জোরদারকরণ এবং আধুনিকায়ন প্রকল্প।
২৯।	দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ বিষয়ক খামারী প্রশিক্ষণ প্রদান প্রকল্প।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম
৩০।	সংকর জাতের গবাদিপশুর রিপ্রোডাক্টিভ রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।
৩১।	অপ্রচলিত পোল্ট্রি খামার সম্প্রসারণ প্রকল্প।
৩২।	ক্ষুদ্র ও মাঝারী পোল্ট্রি খামারের জীব নিরাপত্তার উন্নয়ন প্রকল্প।
৩৩।	৫ টি বিদ্যমান সরকারি মুরগি খামারকে ব্রয়লার প্যারেন্টস্টক খামার এ রুপান্তরকরণ প্রকল্প।
৩৪।	দেশব্যাপী সরকারি দুগ্ধখামার আধুনিকায়ন প্রকল্প।
৩৫।	দেশব্যাপী সরকারি পোল্ট্রি খামার আধুনিকায়ন প্রকল্প।
৩৬।	দেশের প্রতি জেলায় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন পকল্প।
৩৭।	লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট থ্রু মিট প্রডাকশন এন্ড ডেইরি রেভ্যুলিউশন প্রকল্প (ফেজ-১)।
৩৮।	লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট থ্রু মিট প্রডাকশন এন্ড ডেইরি রেভ্যুলিউশন প্রকল্প (ফেজ-২)।
৩৯।	লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট থ্রু মিট প্রডাকশন এন্ড ডেইরি রেভ্যুলিউশন প্রকল্প (ফেজ-৩)।
৪০।	উত্তরাঞ্চলে বহি: পরজীবি ও ব্লাড প্রোটোজোয়া নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।
৪১।	গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-১)।
৪২।	গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-২)।
৪৩।	গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-৩)।
৪৪।	ক্ষুদ্র ও মাঝারী পোল্ট্রি খামারের জীব নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প।
৪৫।	সমাজভিত্তিক গরু পালন প্রকল্প।
৪৬।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্পর্কিত আইন কাঠামো বাস্তবায়ন সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-১)।
৪৭।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্পর্কিত আইন কাঠামো বাস্তবায়ন সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২)।
৪৮।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্পর্কিত আইন কাঠামো বাস্তবায়ন সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-৩)।
৪৯।	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প।
৫০।	অঞ্চলভিত্তিক গবাদিপশু ও পোল্ট্রি উৎপাদন এলাকা নির্দিষ্টকরণ সার্ভে প্রকল্প।
৫১।	প্রাণিজাত পণ্য ও উপজাত রপ্তানী সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-১)।
৫২।	১০ টি বিদ্যমান সরকারি মুরগি খামারকে ব্রয়লার প্যারেন্টস্টক খামার-এ রুপান্তরকরণ প্রকল্প।
৫৩।	৫ টি বিদ্যমান সরকারি মুরগি খামারকে লেয়ার প্যারেন্টস্টক খামার-এ রুপান্তরকরণ প্রকল্প।
৫৪।	বাফেলো ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেষ্ট প্রকল্প (ফেজ-১)।
৫৫।	বাফেলো ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেষ্ট প্রকল্প (ফেজ-২)।
৫৬।	বাফেলো ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেষ্ট প্রকল্প (ফেজ-৩)।
৫৭।	অঞ্চলভিত্তিক পাবলিক হেলথ গবেষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্প।
৫৮।	অঞ্চলভিত্তিক প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্প।
৫৯।	অঞ্চলভিত্তিক প্রাণিপুষ্টি উৎপাদন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।
৬০।	অটোমেটেড গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বাস্তবায়ন প্রকল্প।
৬১।	র্যা বিস নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-১)
৬২।	র্যা বিস নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-২)
৬৩।	র্যা বিস নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-৩)
৬৪।	ন্যাশনাল জ্যু এ্যানিমেল ব্রিডিং ফার্ম স্থাপন প্রকল্প।
৬৫।	ফর্টিফাইড মিল্ক প্রডাক্ট উৎপাদন প্রকল্প (ফেজ-১)
৬৬।	ফর্টিফাইড মিল্ক প্রডাক্ট উৎপাদন প্রকল্প (ফেজ-২)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম
৬৭।	ফর্টিফাইড মিল্ক প্রডাক্ট প্রোমোশন প্রকল্প।
৬৮।	জাতীয় হরিণ প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প।
৬৯।	গবাদিপশুর অটোমেটেড রেকর্ড কিপিং প্রকল্প।
৭০।	অটোমেটেড পেট এ্যানিমেল অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বাস্তবায়ন প্রকল্প।
৭১।	এগ বর্ণ ডিজিজ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-১)
৭২।	এগ বর্ণ ডিজিজ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ফেজ-২)
৭৩।	পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (ফেজ-১)
৭৪।	পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (ফেজ-২)
৭৫।	টার্কি খামার স্থাপন সম্প্রসারণ ও প্রকল্প
৭৬।	কোয়েল খামার স্থাপন সম্প্রসারণ ও প্রকল্প
৭৭।	তিতির খামার স্থাপন সম্প্রসারণ ও প্রকল্প
৭৮।	কবুতর খামার স্থাপন সম্প্রসারণ ও প্রকল্প